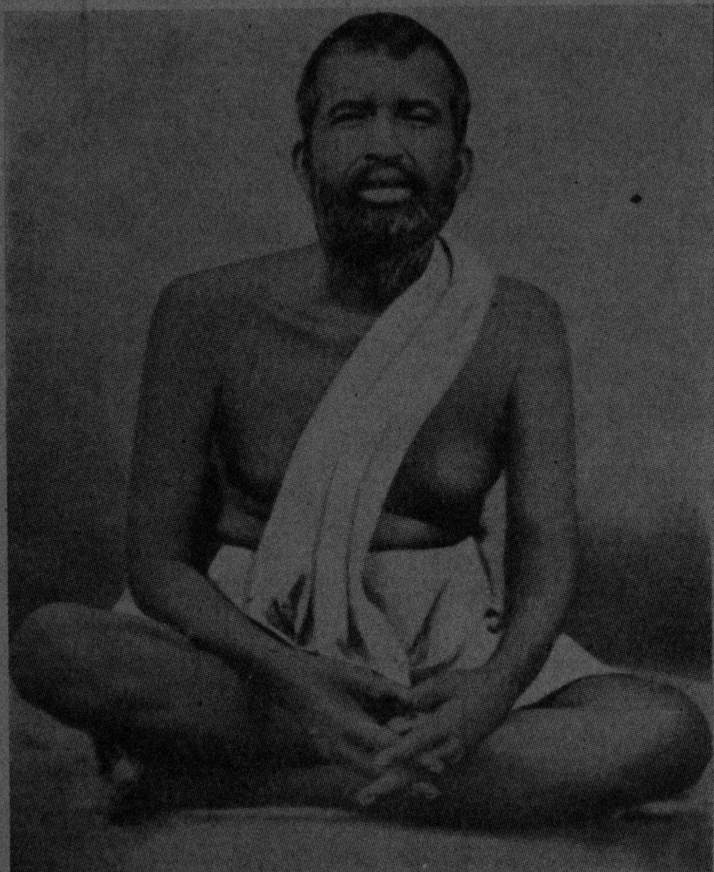
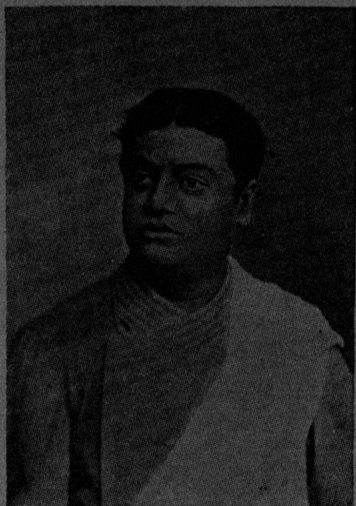


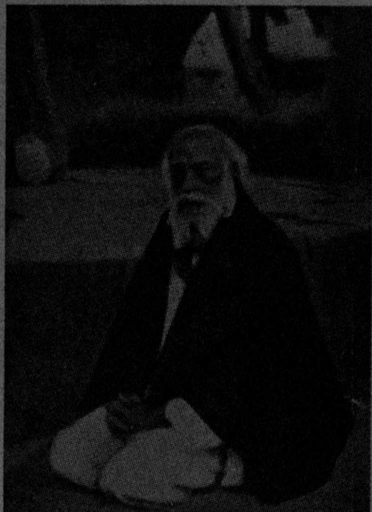
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

আবির্ভাব
১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৬ খৃঃ

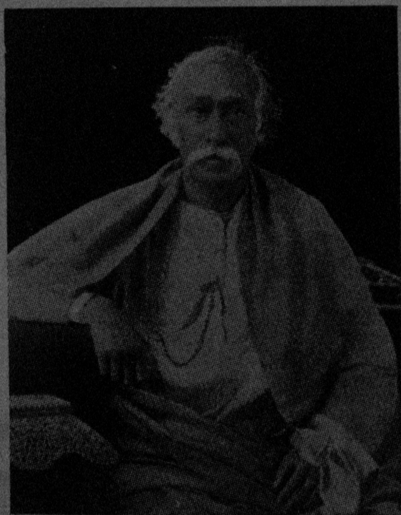
তিরোভাব
১৫ই আগষ্ট, ১৮৮৬ খৃঃ



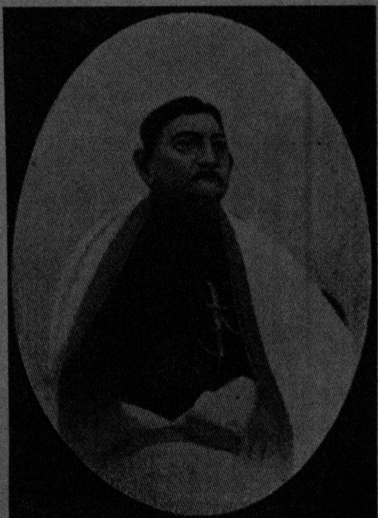
স্বামী বিবেকানন্দ



মহেন্দ্রলাল গুপ্ত (মাষ্টারমশায়)
(পরিণত বয়সে)



ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার



গিরিশচন্দ্র ঘোষ

[illegible]বাসী যুগে যুগে

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্সের পক্ষে প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯৫২

আড়াই টাকা

নবজীবন প্রেসের পক্ষে মুদ্রাকর—শ্রীতীর্থনাথ পাল
৬৬, গ্রে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৬

পূজনীয়া

মাতৃদেবীর

শ্রীচরণে

ভূমিকা

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী ও জীবনী আজ ভারতের, বিশেষ করিয়া বাংলার শিক্ষিত সমাজে আলোচিত হইতেছে ; ইহা আনন্দের কথা, আশার কথা। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী পাশ্চাত্যের জড়বাদের ভাবসংঘাতে নিজের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, স্বজাতীয়তা—স্বকীয় সব কিছুকে ব্যঙ্গ করিতে শিখিয়াছিল, প্রাণপণে পরানুকরণ করিতেছিল। আবার ঐ সময়ই বাংলার এক বিশেষ নবজাগরণের যুগ। প্রায় একই সময়ে বাংলায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু মনীষী, সাহিত্যিক ও কবি, রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ধর্ম্মাচার্য্যগণ বাংলায় স্বজাত্যবোধের নবচেতনার সৃষ্টি করেন। ইঁহাদের সমসময়ে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ীতে এক অশিক্ষিত গ্রাম্য যুবক তাঁহার অসামান্য সাধনার সিদ্ধির সৌরভে বহু জ্ঞানী গুণীকে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট করিতেছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, আর্য্যসমাজী, ব্রাহ্ম প্রভৃতি বহু ধর্ম্মের জ্ঞানী গুণীগণ এই সরল সহজ মানুষটির কাছে আসিতে আরম্ভ করেন এবং প্রায়-বর্ণপরিচয়হীন এই অসাধারণ সাধকের সঙ্গলাভে নিজদিগকে কৃতার্থ ও ধন্য মনে করিতেন। দক্ষিণেশ্বরের এই মন্দিরেই সকলের অলক্ষিতে গড়িয়া উঠিতেছিল একদল নিষ্কাম ত্যাগী সন্ন্যাসীর দল—যাঁহারা ভবিষ্যতে ভারতকে তথা জগতকে শুনাইলেন, বুঝাইলেন বেদের সেই অমৃতময়ী বাণী—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ…', যাঁহারা জগতে প্রচার করিলেন যে, হিন্দুর পূজার পুতুলটাই বড় নয় ; রূপকের অন্তরালে আছেন যে অরূপ—সেই সচ্চিদানন্দেরই পূজা করে হিন্দু। তথাকথিত অশিক্ষিত, দরিদ্র, সরল এই ব্রাহ্মণ সাধকের জন্ম হইতে মহাসমাধি পর্য্যন্ত, জীবনের

প্রতিটি পদক্ষেপ, তাঁহার নিজের ও অপরের সাধনার ইতিহাস—সে বিরাট পটভূমিকা লইয়া নাটক রচনার সাহস ও শক্তি আমার নাই।

১৮৮১ খৃঃ অব্দের মধ্যভাগ হইতে ১৮৮৬ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত কয়েকটি ঘটনার সমাবেশে এই নাটকের সৃষ্টি। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত, স্বধর্ম্মে আস্থাহীন, সত্যসন্ধানী নরেন্দ্রনাথের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসার পর হইতে তাঁহার মনে যে দ্বিধা দ্বন্দ্বের ঝড় উঠিয়াছিল, তাহারই পটভূমিকায় এই নাটক রচিত। এত সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া নাটক রচনায় যে অসুবিধা তাহা আশা করি সুধীজন বুঝিবেন। নাটকের প্রয়োজনে কোনোরূপ ঘটনা বা চরিত্রের পরিবর্ত্তন অথবা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ সম্ভব নহে। যথাসাধ্য চরিত্র ও ঘটনা যথাযথ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি; তবে কোথাও কোথাও নাটকের গতি রক্ষার্থ সামান্য আগুপাছু সময়ের ঘটনা বা সংলাপকে একই দৃশ্যভুক্ত করিতে হইয়াছে। আশা করি ঐতিহাসিকগণ ইহা মার্জনা করিবেন। গিরিশ ঘোষের নিকট হইতে খিচুরী খাওয়ার ঘটনাটি কোনো প্রামাণ্য জীবনীতে পাই নাই, কিন্তু রামকৃষ্ণ মঠের কোনো বিশিষ্ট সন্ন্যাসী উহা ঠাকুরের কোনো সাক্ষাৎ শিষ্যের কাছে শোনা ঘটনা বলায় আমি উহা ব্যবহার করিয়াছি; অবশ্য পায়স খাওয়ার উল্লেখ কথামৃতে আছে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "জান্তে, অজান্তে বা প্রান্তে যে কোন ভাবেই হোক না কেন, তাঁর নাম করলেই ফল হবে। কেউ তেল মেখে নাইতে যায়, তারও যেমন স্নান হয়, কাউকে যদি জলে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়, কি কেউ শুয়ে আছে তার গায়ে জল ঢেলে দিলে তারও তেমনি স্নানের কাজ হয়।"···"অমৃতকুণ্ডে যে কোনো প্রকারে পড়তে পারলেই অমর হওয়া যায়। কেউ যদি স্তব-স্তুতি করে পড়ে, সেও অমর হয়, আর কাউকে যদি কোনো রকমে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়, সেও অমর হয়।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র জীবন কথা ও বাণী যেভাবেই আমরা আলোচনা করি, তাহাতেই আমাদের মনের উন্নতি হয়। এই দেবমানবের লীলাপ্রসঙ্গ ও

কথামৃত পড়িতে পড়িতে জীবনে এক নূতন আলোকের স্পর্শ অনুভব করি এবং মনে হয় যে এই মহাপুরুষের চরিত্র ও বাণীর অমৃত স্পর্শ আবালবৃদ্ধবণিতা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই পাওয়া উচিত। নাটকের মাধ্যমে তাহা সুগম হইবে মনে হওয়ায় এই নাটক ১৯৫১ সালের ২৩শে এপ্রিল লাভপুর গ্রামে প্রথম লিখিতে আরম্ভ করি। পরে ইহা ১৭ই নভেম্বর (১৯৫১) তারিখে লাভপুর অতুলশিব ক্লাবের সভ্যগণ কর্ত্তৃক অভিনীত হয়। দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত উচ্ছ্বাসে ও অনুরোধে এই নাটকটি পুস্তকাকারে প্রকাশের প্রেরণা পাই।

অতুলশিব ক্লাবের অভিনেতাগণ এবং আমার যে সকল সহৃদয় বন্ধু তাঁহাদের সমালোচনা ও পরামর্শ দ্বারা এই নাটকটীর রচনায় সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

গ্রন্থকার

৩১ বি একডালিয়া রোড
বালীগঞ্জ, কলিকাতা ১৯।
৯ ৬ ৫২

চরিত্র-লিপি

—পুরুষ—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব—(নাটকের সূচনাকালীন বয়স প্রায় ৪৬ বৎসর)

নরেন্দ্রনাথ দত্ত— (,, ,, বয়স প্রায় ২০ বৎসর)

রাখালচন্দ্র ঘোষ— (,, ,, বয়স ২০।২১ বৎসর)

লাটু—ছাপরাবাসী, বাংলা কথা বলিতে বেশ টান আছে। রাম দত্তের ভৃত্য; নিরক্ষর যুবক। পরে ঠাকুরের কাছে থাকিত।

মাষ্টার—মহেন্দ্র গুপ্ত, স্কুলের হেড্‌মাষ্টার; বিবাহিত। বয়স ২৮।৩০ বৎসর।

কিশোরী গুপ্ত—ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

বৈকুণ্ঠ সান্যাল—গৃহী ভক্ত। বিবাহিত। বয়স আন্দাজ ৩০ বৎসর।

প্রতাপ হাজরা—গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী, প্রৌঢ়।

মণি মল্লিক—ব্যবসায়ী ভক্ত, প্রৌঢ়।

রাম দত্ত—গৃহী ভক্ত। বয়স আন্দাজ ৩৫।

ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়—গৃহী ভক্ত, যুবক।

কালীপ্রসাদ চন্দ্র—ভক্ত, সংসারত্যাগী যুবক।

যোগীন্দ্র রায়চৌধুরী—ধনী ভক্ত, যুবক।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র (ছোট নরেন)—ছাত্র ভক্ত, বয়স আন্দাজ ১৬।১৭।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—নাট্যাচার্য্য ; বয়স প্রায় ৪০ বৎসর।

ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার—খ্যাতনামা প্রবীন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার।

সাতকড়ি, দাশরথি, হেমালী—নরেন্দ্রনাথের সমবয়সী বন্ধু।

ভক্তগণ, সাধু, সম্পাদক, বন্ধু, ধনী বন্ধু, লোক, মহিমা চক্রবর্ত্তী, কালীপদ ঘোষ, সরকার, মাতাল, ইত্যাদি।

—স্ত্রী—

শ্রীমা (সারদাদেবী)—ঠাকুরের সহধর্ম্মিণী, বয়স প্রায় ২৮ বৎসর।

ভুবনেশ্বরী—নরেন্দ্রনাথ দত্তের মাতা।

জনৈকা স্ত্রীলোক, বাইজী, বিনোদিনী অভিনেত্রী।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দক্ষিণেশ্বর। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘর। ঘরের একধারে তক্তায় শয্যা পাতা। তাহার কাছে একটি ছোট তক্তাপোষ। একধারে জলের জালা। রামকৃষ্ণদেব ছোট তক্তায় বসিয়া। সামনে মেঝেতে মাতুরে বৈকুণ্ঠ সান্যাল, সম্পাদক, ২।৩ জন স্ত্রীলোক ও কয়েকজন পুরুষ ভক্ত ও সন্ন্যাসী বসিয়া। একজন বৈরাগী গোপীযন্ত্রে গান গাহিতেছে :

গান

স্থর—প্রসাদী, একতালা

মন হারালে কাজের গোড়া।
তুমি দিবা নিশি ভাব বসি, কোথায় পাবে টাকার তোড়া॥
চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র, শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া।
তুই কাঁচ মূল্যে কাঞ্চন বিকালি, ছি ছি মন
তোর কপাল পোড়া॥
কর্ম্ম সূত্রে যা আছে মন, কেবা পাবে তার বাড়া,
মিছে এদেশ সেদেশ করে বেড়াও বিধির লিপি কপাল জোড়া॥

কাল করিছে হৃদয়ে বাস, বাড়ছে যেন শালের কোঁড়া।
ওরে সেই কালের কর বিনাশ ন্যাস ধররে মন্ত্র সোঢ়া॥
প্রসাদ বলে ভাবছ কি মন পাঁচ শোয়ারের তুমি ঘোড়া।
সেই পাঁচের আছে পাঁচাপাঁচি তোমায় করবে তোলাপাড়া॥

ঠাকুর—(গান শেষে) বাঃ বাঃ বাবাজী, বেশ গান তোমার। বেশ কথা। কিন্তু বোলছ কাকে? কুমীরের গায়ে অস্ত্র মারো, অস্ত্রই ঠিক্‌রে পড়ে যায়। তার গায়ে কিছুতেই লাগে না। মায়ায় বদ্ধ জীবের কাছে ধর্ম্মকথা যতই বল কিছুতেই তাদের প্রাণে লাগাতে পারবে না।

বৈকুণ্ঠ—তবে কি আমাদের মায়া কাটবে না? মুক্তি হবে না?

ঠাকুর—মায়া কি রকম জানো? পানা পুকুরে নেবে যদি পানাকে সরিয়ে দাও, আবার পানা এসে জোটে। সেই রকম মায়াকে ঠেলে দিলেও আবার মায়া এসে জোটে। তবে যদি পানাকে সরিয়ে বাঁশ বেঁধে দেওয়া যায়—তাহলে আর বাঁশ ঠেলে পানা আসতে পারে না। সেই রকম মায়াকে সরিয়ে দিয়ে জ্ঞান ভক্তির বেড়া দিতে পারলে আর মায়া তার ভেতর আসতে পারে না।

সম্পাদক—আচ্ছা মশাই, সর্ব্বজীবে যখন নারায়ণ, তখন এত ভালমন্দ পাপপুণ্যের বিচার কেন?

ঠাকুর—দেখ, সব জল নারায়ণ বটে কিন্তু সব জল ত' খাওয়া যায় না। কোনো জলে পা ধোওয়া যায়, কোনো জল বা খাওয়া যায় আবার কোনো জল ছোঁওয়া পর্য্যন্ত যায় না। সব জায়গাতেই ঈশ্বর আছেন বটে কিন্তু সব জায়গায় যাওয়া যায় না। বাঘের মধ্যেও ঈশ্বব আছেন সত্য কিন্তু বাঘেব সামনে যাওয়া উচিত নয়। তেমনি কুলোকের মধ্যেও ঈশ্বর আছেন বটে কিন্তু কুলোকের সঙ্গ করা উচিত নয়।

সন্ন্যাসী—দেখুন পরমহংস বাবা, আমি অনেক সাধন ভজন করে দেখলাম কিন্তু কিছুই ফল পেলাম না। ভাগ্যে না থাকলে শুধু সাধনায় কিছু হয় না। কি বলেন?

ঠাকুর—দেখ গো, যাবা খানদানী চাষা তারা বার বৎসর অনাবৃষ্টি হলেও চাষ দিতে ছাড়ে না। আব যারা ঠিক চাষা নয়—চাষের কাজে বড় লাভ শুনে কারবার করতে আসে তারাই এক বৎসর বৃষ্টি না হলেই চাষ ছেড়ে দিয়ে পালায়। যাঁরা ঠিক ঠিক ভক্ত তাঁরা সমস্ত জীবন দর্শন না পেলেও সাধনা করতে ছাড়েন না।

সন্ন্যাসী—তাহলে দোহাই আপনার, তাঁকে পাবার সোজা পথ বলে দিন।

ঠাকুর—পথ কি একটা গো, যে সোজা পথ দেখিয়ে দোব। এই কালীবাড়ীতে তোমরা আসো, এর কি একটা পথ? কেউ নৌকায় আসে, কেউ গাড়ীতে, কেউ বা পায়ে হেঁটে। পার্ব্বতী

মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ঠাকুর সচ্চিদানন্দ রূপের খেই কোথায় ?" মহাদেব বল্লেন, "বিশ্বাস"। মতে কি পথে কিছু এসে যায় না। চাই বিশ্বাস আর ব্যাকুলতা।

সন্ন্যাসী—ও'রকম এড়িয়ে গেলে চলবে না। পথ বলে দিতেই হবে। অনেক আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি, আপনি সিদ্ধপুরুষ—আমার উপায় করে দিতেই হবে।

ঠাকুর—ভগবানকে পেতে হ'লে ঝড়েব এঁটো পাতা হতে হবে। পাতার নিজের কোন ইচ্ছা বা অভিমান থাকে না। বাতাস উড়িয়ে যে দিকে নিয়ে যায় সেই দিকে যায়। কখনও আস্তাকুঁড়ে কখনও বা ভাল জায়গায়। তাকে পাবার অনেক ভাব আছে, তার মধ্যে দাস ভাবই ভাল। আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী ; আমি ঘর, তুমি ঘরণী ; আমি রথ, তুমি রথী ; যেমন বলাও তেমনি বলি ; যেমন করাও তেমনি করি ; যেমন চালাও তেমনি চলি ; এই ভাবই সহজ রাস্তা।

সম্পাদক—মশায়, বৈষ্ণবদের এই দাস্য ভাবের ফলেই দেশটা উচ্ছন্নে গেছে। "প্রভু হে" করে যত কুঁড়ে বেকাবের দল দেশটা ছেয়ে ফেল্লে। আবার আপনিও ঐ মত প্রচার কর্চ্ছেন ?

ঠাকুর—ওগো, আমি কি টিয়ে পাখী হতে বলছি ? টিয়ে পাখী সমস্ত দিন 'রাধাকৃষ্ণ' বলে কিন্তু বেড়ালে যখন ধরে তখন 'রাধাকৃষ্ণ' ভুলে গিয়ে ট্যাঁ ট্যাঁ করে। ভাবের ঘরে চুরি থাকলে হবে না।

দেখ গো 'নাক তেবে কেটে তাক' বোল মুখে বলা সহজ, হাতে বাজান কঠিন। ধর্ম্ম কথা বলা সহজ, কাজে করা কঠিন।

বৈকুণ্ঠ—মশায়, আমরা যারা সংসারের মায়ায় জড়িয়ে পড়েছি—আমাদের কি উপায় হবে না? সংসার না ছাড়লে কি মুক্তি হবে না?

ঠাকুর—সংসারে থাকবে বৈকি কিন্তু পাঁকাল মাছের মত। পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে কিন্তু গায়ে কাদা লাগে না। তেমনি সংসারের সব কাজই কোরবে কিন্তু মনটি ভগবানের দিকে রাখবে। পশ্চিমের মেয়েদের দেখেছো। মাথায় দুধের হাঁড়ি নিয়ে চলেছে; কত গল্প কোবছে, পথ চোলছে, কিন্তু মাথাব হাঁড়িটী ঠিক আছে, কাবণ মনটী তাদের ঐখানে। তেমনি সংসারের সব কাজ কববে, কিন্তু মনটী ভগবানেব দিকে রাখবে।

সম্পাদক—মশায় সবাই যদি সাধন ভজন কোরে সন্ন্যাসী হবে তাহলে সংসার যে অচল হবে, সৃষ্টি চলবে কি করে?

ঠাকুর—সে ভাবনাটা স্রষ্টা ভগবানের ওপব ছেড়ে দাওনা বাপু। তুমি আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে যাও।

সম্পাদক—মানে?

ঠাকুর—দুজন লোক একটা আম বাগানে বেড়াতে গেল। তাদের মধ্যে যাব বিষয় বুদ্ধি বেশী সে বাগানে ঢুকেই কটা আম গাছ, কোন গাছে কটা আম হয়েছে, বাগানের কত দাম হতে পারে

তারই হিসাব কর্ত্তে লাগলো। আর একজন বাগানের মালিকের সঙ্গে আলাপ করে গাছতলায় বসে একটি করে আম পাড়তে লাগলো আর খেতে লাগলো। আম খাও, পেট ভরবে। কেবল পাতা গুণে আর হিসেব কিতেব করে লাভ কি ?

প্রবীণ ভক্ত—আহা কি সুন্দর কথা !

সম্পাদক—তা বলে মশায় শুধু ভগবানের দোহাই দিয়ে নিষ্ক্রিয় হলে কি চলে ? তিনি ত আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন। সবাই যদি সন্ন্যাসী হবে তা'হলে সৃষ্টি থাকবে কি কোবে ? তাতে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা হবে যে।

ঠাকুর—ঐ ঐ বলে কি ? তাঁর কি ইচ্ছা যে সকলেই শেয়াল কুকুরেব মত কামিনী-কাঞ্চনে মুখ থুবরে পড়ে থাকে ?

সম্পাদক—তা মশায় তাঁব ইচ্ছাতেই ত সংসার ও সৃষ্টি।

ঠাকুর—তাঁর ইচ্ছায় সংসার করা বলছ, যখন স্ত্রী পুত্র মবে তখন ভগবানের-ইচ্ছা দেখতে পাওনা কেন ? যখন খেতে পাওনা—দারিদ্র্য—তখন ভগবানেব ইচ্ছা দেখতে পাওনা কেন ?

বৈকুণ্ঠ—মন মানে না যে,—

ঠাকুর—মন ত ধোপা ঘরেব কাপড় গো। যে বঙে ছোপাবে সেই রঙ্ হবে, (অর্দ্ধ স্বগত ভাবে) মা, মাগো আর যে পারি না মা। যাদের সব এখানে আসবার কথা তাদের শীগ্রী শীগ্রী এনে দে মা।

বৈকুণ্ঠ—ভগবান কি সাকার না নিরাকার ?

ঠাকুর—তিনি সবই হতে পারেন। সাকার নিরাকার কেমন জানো? যেমন জল আর বরফ। যখন জল জমাট বেঁধে থাকে তখন সাকার; আর যখন গলে জল হয় তখনই নিরাকার—তুই-ই এক বস্তু। ভক্তি-হিমে জমে তিনি সাকার হয়ে দর্শন দেন; আবার জ্ঞান-সূর্য্য উঠলে সেই সাকার-রূপ বরফ গলে জল হয়ে যায়; সব তখন নিরাকার হয়।

(জনৈকা স্ত্রীলোক কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া আছড়া খাইয়া ঠাকুরের পায়ের কাছে পড়িল)

স্ত্রীলোক—ঠাকুর, ঠাকুর আমায় দয়া কর, রক্ষা করো।

ঠাকুর—কি গো বাছা, কি হয়েছে তোমার?

স্ত্রীলোক—আমাব ছেলের বড় অসুখ, ডাক্তারেরা জবাব দিয়ে গেছে। ঠাকুর, আমার সাতটী ছেলে-মেয়ে.........আমি রাক্ষসী......... ছ'টী খেয়েছি, এটিকে কেড়ে নিওনা ঠাকুর। আমি তোমার মাকে বুক চিরে রক্ত দিয়ে পূজো দোব। আমার ছেলেকে সারিয়ে দাও ঠাকুর।

ঠাকুর—(ভক্তদের) দেখছ গা, কুমীরের চামড়া!

(সকলের মৃদু হাস্য)

তা বাছা আমি কি করবো? আমি ত ঝাড়ফুঁক জানি না, মাকে ডাকো।

স্ত্রীলোক—তুমি কি যে সে লোক বাবা। আমরা যে সব জানি বাবা, তুমি লাল জবাগাছে সাদা ফুল ফোটাতে পারো। তুমি কত লোকের রোগ সারিয়ে দিয়েছ—তোমার কত ক্ষমতা—দাওনা বাবা আমার ছেলের ব্যারাম সারিয়ে—এই একটিবার দয়া করো—আর আমি কখনও কিছু চাইব না তোমার কাছে।

ঠাকুর—(ভক্তদের প্রতি) দেখ উট কাঁটা ঘাস খেতে ভালবাসে। খেতে খেতে মুখ দিয়ে দরদর কোরে রক্ত পড়ে, তবুও সে কাঁটা ঘাস খেতে ছাড়বে না। এত দুঃখ কষ্টে পড়েও সংসারী বদ্ধ জীবের কিছুতেই আর হুঁস হয় না।

স্ত্রীলোক—বাবা আমি তোমায় গুরু করব। তোমার কাছে মন্ত্র নোব। আমার যা কিছু আছে ......

ঠাকুর—ওগো বাছা গুরু মিলে লাখে লাখ, চেলা নাহি মিলে এক। যাও বাড়ী গিয়ে শিব পূজো করো গে। আর মন দিয়ে হরি নাম করো; সব দুঃখ দূর হবে।

স্ত্রীলোক—(যেন পরম আশ্বাস পাইয়া) হবে? তুমি বোলছ বাবা দুঃখ দূর হবে? শিব পূজো আর হরি নামেই আমার ছেলে ভাল হয়ে যাবে?

ঠাকুর—জীবে দয়া, ভক্ত সেবা আর নাম সংকীর্ত্তন বিষয়ীদের এই-ই যথেষ্ট। প্রাণ দিয়ে তাকে ডাকো দেখি—

(নিজে ভাবমুখে গান ধরিলেন)

যুগে যুগে

প্রথম দৃশ্য

গান

ডাক দেখি মন ডাকার মত,
কেমন শ্যামা থাকতে পারে,
কেমন শ্যামা থাকতে পাবে,
কেমন কালী থাকতে পাবে।
মন যদি একান্ত হও, জবা বিল্বদল লও,
ভক্তি চন্দন মিশায়ে (মাব) পদে পুষ্পাঞ্জলী দাও।

(গাহিতে গাহিতে ভাবে মাতোয়াবা হইযা বাহির হইয়া গেলেন। কোঁচাব কাপড কাঁধ হইতে পডিয়া মাটীতে লুটাইতে লাগিল, ভ্রূক্ষেপ নাই। মাতালেব ন্যায় টলিতে টলিতে চলিযা গেলেন। বৈকুণ্ঠ, স্ত্রীভক্ত ও অন্যান্য ভক্তরা তাঁহাব অনুসবণ কবিল। শুধু সম্পাদক সন্দিগ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া এই ভাব দেখিতে লাগিলেন। প্রবীণ ভক্তটি ঠাকুবের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কবিল। এমন সময় পাশেব দবজা দিযা নবেন্দ্র, ভবনাথ, রাম, সাতকড়ি ও কয়েকজন কলেজেব ছাত্র প্রবেশ কবিল। কথাবার্ত্তা সুরু হইতে বাম বাহির হইয়া গেল।

সম্পাদক—আরে নবেন্দ্র যে! দক্ষিণেশ্বরে তুমি কি মনে করে?

নবেন্দ্র—প্রশ্নটা ত তোমাকেও করতে পাবি।

সম্পাদক—একশ'বার। আমি এসেছি সম্পাদক হিসাবে। পরমহংস মশায় সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন, তাই দেখতে এসেছি ভদ্রলোক সত্যই কি রকম সাধু।

নরেন্দ্র—কি রকম দেখলে ?

সম্পাদক—Perfectly normal—গেরুয়া নেই, ভৈরবী নেই, জটা ভস্ম নেই, অথচ সাধু! ভদ্রলোক কথাবার্ত্তা বেশ বলেন।

নরেন্দ্র—ভাবটাব দেখলে ? শুনেছি নাকি প্রায়ই ভাব সমাধি হয়, তখন আর একেবারেই বাহ্যজ্ঞান থাকে না।

সম্পাদক—Really—কৈ তেমন কিছুত দেখিনি। কে বল্লে ?

নরেন্দ্র—আমাদের কলেজের প্রফেসর রেভারেণ্ড হেষ্টি সে দিন Words-worth পড়াবার সময় ভাব সমাধির কথা বলছিলেন। তিনিই বল্লেন পরমহংস মশায়ের নাকি ঐ রকম ভাব হয়, তাই দেখতে এসেছি।

ভবনাথ—সেদিন তোমায় যে সুবেনবাবু তাঁর বাড়ীতে এঁর সামনে গান গাইতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেদিন কিছু দেখনি ?

নরেন্দ্র—এমন কিছু না।

সম্পাদক—তাহলে এসব ভক্তদের বাড়াবাড়ি হতে পারে।

প্রবীণ ভক্ত—না হে, এর মধ্যে বাড়াবাড়ির কিছুই নেই। ইনি মহাপুরুষ পরমহংস, ভগবানের নাম করতে করতে সত্যই বেহুঁস হয়ে যান—একেবারে বাহ্যজ্ঞান থাকে না।

নরেন্দ্র—দেখুন, ও রকম ভাবের চালাকী ন্যাড়ানেড়িদের কেত্তনেও দেখা যায়। কেত্তন গাইতে গাইতে "হা চৈতন্য" করে দড়াম করে আছাড় খেয়ে মুর্চ্ছা গেল, কিন্তু যেই প্যালা পোড়ল অমনি হাত বাড়িয়ে তা ট্যাঁকে গুঁজলো।

(সকল বন্ধুদের হাস্য)

প্রবীণ ভক্ত—এখানে ত প্যালা দিতে হয় না। আচ্ছা বাপু, তোমরা ইংরেজী পড়া ছোকরা ; যখন এসব মানো না, এখানে আসো কেন ? এখানে ত সং ওঠে নি।

সাতকড়ি—উঠেছে শুনেই ত এসেছি মশায়। ধর্ম্মের নামে কত রকম বুজরুকি চলে তাই দেখতে এসেছি। এই পরম বকটী শুনেছি ভাবের ঘোরে কেবল মেয়েদের মধ্যেই মূর্চ্ছা যান।

প্রবীণ ভক্ত—রাধামাধব ; রাধামাধব। এ সব মিথ্যা কে বল্লে ? এঁর মত কামকাঞ্চন-ত্যাগী পুরুষ সম্বন্ধে ওকথা বল্লে নরকেও জায়গা হবে না।

নরেন্দ্র—তা মশায়, সাধু ত বনে গেলেই হয়। এখানে এত লোক জড় করা কেন ? গৃহস্থের অন্দরে যাতায়াত কেন ? সত্যিকার সাধু তপস্যা কোরবে ; তারা কি বড়লোকের মন্দিরে বসে ভোগ খাবে, আর নিজেকে প্রচার করবে ?

সম্পাদক—By the way নরেন তুমিত এখন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম নিয়েছ ; তাদের প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করেছ শুনেছি।

নরেন্দ্র—হ্যাঁ।

সম্পাদক—তবে তুমি এ হিন্দু সাধুর কাছে কেন? ইনি ত শুধু কালী কালী করেন, আর তুমি বিশ্বাস কর নিরাকার ব্রহ্মে।

নরেন্দ্র—আমি সত্যের সন্ধানে ফিরছি, কারু কাছে ত দাসখত দিইনি। তবে খড়মাটির পুতুলের ভেতর যে অনন্ত বিশ্বের স্রষ্টার সন্ধান পাওয়া যাবে না, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এ সব পৌত্তলিকতা বামুনদের বজ্জাতি। তোমাদের ও শাঁখ ঘণ্টা নেড়ে, ঢাক ঢোল বাজিয়ে সেই সচ্চিদানন্দকে পাওয়া যায় না।

সম্পাদক—তবে এ হিন্দু সাধুর কাছে এসেছ কেন?

নরেন্দ্র—আমাদের আচার্য্য কেশব সেন মশায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মত লোকও ভদ্রলোকের কাছে প্রায়ই আসেন শুনেছি। বামদা'ও বলেন ইনি নাকি অবতার; তাই দেখতে এসেছি লোকটি কেমন।

প্রবীণ ভক্ত—তোমাদের মত নাস্তিক নীচমনাদের তিনি মুখ দর্শনও করেন না।

(ঠাকুরের প্রবেশ ও নরেন্দ্রকে দেখিয়া অতিপরিচিতকে দেখার মত আনন্দে তাহার হাত ধরিয়া)

ঠাকুর—এসেছ, তুমি এসেছ? এস, এস। সেদিন সুরেনের বাড়ীতে অত কোরে বোল্লাম আসতে; তা—এতদিন পরে মনে পোড়ল? সেদিন তোমার গান বড় মিষ্টি লেগেছিল। কি কি গান জানো? হিন্দি আসে?

নরেন্দ্র—আজ্ঞে না, দুচারটে বাংলা গান জানি।

ঠাকুর—হোকনা একটা ; খাসা গলা তোমার।

নরেন্দ্র—আজ্ঞে ব্রাহ্ম সমাজের গান, গাইব ?

ঠাকুর—বেশ ত তাই গাও। যা মনকে ভগবানের দিকে নিয়ে যায় তাই ভালো। কি জানো, ছাদে ওঠা নিয়ে কথা ; কেউ সিঁড়ি দিয়ে ওঠে, কেউ মই দিয়ে ওঠে, কেউ বা দড়ি দিয়ে ওঠে। ওঠবার পথ ভিন্ন, কিন্তু ছাদে একবার উঠলে তখন সব সমান।

নরেন্দ্র—(মেজেতে বসিয়া)

—গান—

যাবে কিহে দিন মোর বিফলে চলিয়ে
আছি নাথ দিবা নিশি আশাপথ নিরখিয়ে।
তুমি ত্রিভুবন নাথ, আমি ভিখারী অনাথ,
কেমনে বলিব তোমায়, এস হে মম হৃদয়ে।
হৃদয় কুটীর দ্বার খুলে রাখি অনিবার,
কৃপা করি একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে॥

ঠাকুর—চমৎকার, চমৎকার। এস এস আমার সঙ্গে এস।

(নরেন্দ্রের হাত দুই হাতে ধরিয়া ভাবাবিষ্টের মত বাহির হইয়া গেলেন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

উত্তরের বারান্দা। থামের অন্তরালগুলি ঝাঁপ দিয়া ঘেরা। নরেন্দ্রের হাত ধরিয়া ঠাকুর প্রবেশ করিলেন। সহসা নরেন্দ্রের দুই হাত ধরিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে (আনন্দে) পরম স্নেহে অতি পরিচিতের ন্যায় বলিতে লাগিলেন।

ঠাকুর—এতদিন পরে আসতে হয়! আমি যে তোমার জন্যে পথ চেয়ে বসে আছি,—তাকি একবারও ভাবতে নাই? বিষয়ী লোকদের বাজে কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হোয়ে গেল। ওরে প্রাণের কথা বলবার লোক না পেয়ে আমার যে পেট ফুলে উঠছে। বল, বল তুই আসবি, আমার কাছে আসবি।

নরেন্দ্র—(স্বগতঃ) এ ত দেখছি পাগল! শেষে কি পাগলের পাল্লায় পড়লাম!

(সহসা হাত জোড় করিয়া দেবতার মত সম্মান দেখাইয়া)

ঠাকুর—আমি জানি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ; জীবের দুর্গতি নিবারণ কোরতে আবার শরীর ধারণ কোরেছ। এস প্রভু, তোমার কাজ আরম্ভ করো। সমাজের এই দুর্দ্দিনে উদার আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রচার কোরে যুগ প্রয়োজন পূর্ণ করো; জগতের কল্যাণ করো।

নরেন্দ্র—মশায় এসব কি পাগলামী কোরছেন। আমি শিমলার বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন্দ্র দত্ত।

ঠাকুর—(সহজভাবে) ওঃ বেশ বেশ। দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও। এক্ষুনি আসছি।

(ঠাকুর কিছু মাখন মিছরী ও সন্দেশ লইয়া আসিলেন।)

আচ্ছা ঘুমোবার আগে কপালের কাছে একটা জ্যোতি দেখতে পাস ?

নরেন্দ্র—(আশ্চর্য্যে) এ্যাঁ! হ্যাঁ, কপালের কাছে একটা জ্যোতি যেন ঘুবতে থাকে।

ঠাকুর—খাও, এগুলো খাও। অনেক দূর থেকে হেঁটে এসেছ ; বড্ড ক্ষিদে তেষ্টা পেয়েছে।

নরেন্দ্র—আচ্ছা ওগুলো আমাকে দেন। ওঘরে বন্ধুরা বোসে আছে ; সকলে মিলে ভাগ কোরে খাব'খন।

ঠাকুর—আহা ওরা খাবে গো খাবে ; খাওনা, তুমি খাও............

(জোর করিয়া খাওয়াইয়া দিলেন। নরেন্দ্র অগত্যা খাইতে লাগিলেন।)

এবার যে দিন আসবে একা এসো। ও ছোঁড়াগুলোকে জুটিও না। ওরা বিষয়ী, ছোট বুদ্ধি।

নরেন্দ্র—আচ্ছা মশায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ; সত্যি উত্তর দেন ত।

ঠাকুর—বল না গো।

নরেন্দ্র—আপনি ভগবানকে দেখেছেন, না শুধু দেখবার চেষ্টা কোরছেন ?

ঠাকুর—দেখেছি বৈকি ;

নরেন্দ্র—(সবিস্ময়ে) দেখেছেন ? ভগবানকে দেখেছেন ?

ঠাকুর—হ্যাঁগো। একবার কি, যখন খুসী দেখি, তার সঙ্গে কথা বলি। আমাদের মা বেটায় কত পরামর্শ হয়। সেই বেটীই ত আমায় সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেয়। নইলে আমি মুখ্যু মানুষ আমি ঐ সব বেদ বেদান্তর খবর জানবো কেমন কোরে ?

নরেন্দ্র—না, ওরকম পাগলামীর ঝোঁকে দেখা নয়। দুর্ব্বল চিত্ত লোক ভূত দেখার মত মনের খেয়ালে ঐ রকম ভগবান দেখতে পারে ; তার কোন দাম নেই। আপনি যে মায়ের কথা বোলছেন তা ত ঐ পাথরের কালী মূর্ত্তির ?

ঠাকুর—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

নরেন্দ্র—ও আমি বিশ্বাস করি না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা সেই বিরাট ব্রহ্মকে ঐ পাথরের মূর্ত্তির মধ্যে চিন্তা করাও পাপ।

ঠাকুর—যাঁর শক্তির কোনও সীমা নেই, সেই মহাশক্তি ইচ্ছা কোরলে কি একটা মূর্ত্তি নিতে পারেন না, কি কাঠ পাথরে প্রকাশ হোতে পারেন না ? বিরাট সূর্য্যের ছায়া কি এক থালা জলে পড়ে না ? সে ছায়াটা কি সূর্য্যের রূপ নয় ?

নরেন্দ্র—আমাকে আপনি ভগবান দেখাতে পারেন ?

ঠাকুর—পারি বৈ কি। ক'জন তাঁকে দেখতে চায়! লোকে মাগ ছেলের জন্যে ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলে, বিষয় আর টাকার চিন্তায় তাদের ঘুম হয় না, কিন্তু ঈশ্বরকে পেলাম না বোলে কে ওরকম করে বলো ত ? "ভগবান তোমাকে পেলাম না, দেখা দাও" বোলে যদি কেউ ব্যাকুল হোয়ে ডাকে, তবে তিনি নিশ্চয় দেখা দেন। মায়ের ছেলের উপর টান, সতী স্ত্রীর স্বামীর উপর টান আর বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান—এই তিন টানকে এক কোরে যদি ঈশ্বরের দিকে দিতে পারো আমি নিশ্চয় বোলছি তাঁর দেখা পাবেই।

নরেন্দ্র—(আশ্চর্য্যে) ভগবানকে এই চর্ম্ম চক্ষে দেখা যায় ? শুধু অনুভূতি নয়, কল্পনা নয়, দুর্বল মনের মিথ্যা মায়া নয়। ভগবানকে সাকার মূর্ত্তিতে দেখা সম্ভব ?

ঠাকুর—হ্যাঁ গো, এই আমি যেমন তোমায় দেখছি, তুমি আমায় দেখছো। তুমি যেমন আমার সঙ্গে কথা কইছ, মাও তেমনি আমার সঙ্গে কথা বলেন! মায়ের শক্তি দেখতে চাস ?

(সহসা নিকটে আসিয়া নিজ দক্ষিণ পদ নরেন্দ্রের গায়ে স্থাপন করিলেন ও তাহার হাত ধরিলেন। মুখে মৃদু হাস্য)

নরেন্দ্র—একি! একি হচ্ছে! মেঝে দেওয়াল ছাদ সব যে ঘুরছে—একি ঘুরতে ঘুরতে সব যে এক হোয়ে যাচ্ছে। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে ঘুরছে—একি মহাশূন্য—আমার আমিত্ব যে এই মহাশূন্যে লীন হোয়ে যাচ্ছে—ওগো না না—তুমি আমার একি কোরলে? আমার যে বাপ মা আছেন .....(প্রায় সমাধিস্থ হইলেন)।

(ঠাকুর খল খল করিয়া উচ্চ হাস্য করিলেন; পরে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নরেন্দ্রের বক্ষ স্পর্শ করিতে করিতে বলিলেন)

ঠাকুর—তবে এখন থাক্। একেবারে কাজ নেই, কালে হবে।

(নরেন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর তাহার মাথায় হাত রাখিয়া চিন্তাকুল হইয়া স্বগতঃ বলিতে লাগিলেন।)

মা, এ কাকে এনে দিলি? যে সাক্ষাৎ শিবের অংশ, অখণ্ড জ্যোর্তিমণ্ডলের ঘনীভূত অংশ বোলে যাকে দেখালি, সে কি এত দুর্বল!

তৃতীয় দৃশ্য

(দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরের বারান্দা ; মাষ্টার, কিশোরী, হাজরা, রাখাল, লাটু, ভবনাথ গোলকধাম খেলিতেছে।)

রাখাল—(কড়ি খেলিয়া) তিন চিৎ, এই যাঃ ; সংসারে পড়ল গিয়ে ঘুঁটি।

লাটু—তাহলে তোমাকে সংসারে পড়তে হবে ; সাদিত করেস, এবার একপাল ছেলেমেয়ে হোবে।

রাখাল—দূর। তা'হলে ঠাকুরকে দেখবে কে ? সংসার ছেড়ে এলাম আবার বলে সংসারে পড়তে হবে।

হাজরা—(খেলিল) আহা হা আর একটা চিৎ হলে একেবারে ব্রহ্মলোক হোত।

মাষ্টার—তোমার যে শুকনো জ্ঞান, তাই একটা চিৎ কম হলো।

কিশোরী—তোমার আবার খেলার মধ্যে এসব কথা কেন ?

(অন্তরালে গম্ভীর কণ্ঠে ওঁ ওঁ শোনা গেল)

লাটু—এই এই চক্রবর্ত্তী আসছে।

(মহিমা চক্রবর্ত্তীর প্রবেশ। পরনে গেরুয়া, রুদ্রাক্ষ, হাতে তানপুরা ; বেশ ভারিক্কি চেহারা। তিনি সর্ব্বদা শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করেন লাটু বিহারের বাসিন্দা, কিছুদিন বাঙলায় আছে। বিহারীরা নূতন বাংলা শিখিলে ভাষায় যে টান থাকে সর্ব্বত্র সেইভাবে লাটুর কথা উচ্চারিত হইবে।)

মাষ্টার—প্রণাম মহিমাবাবু। আপনার ইস্কুল কেমন চলছে ?

মহিমা—ইস্কুল! ইস্কুল কি হে। প্রাচ্য-আর্য্য-শিক্ষা-কাণ্ড-পরিষৎ। প্রাচ্য এবং আর্য্য জ্ঞানভাণ্ডারের বহুমূল্য রত্নরাজির পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রচলনের প্রচেষ্টায় আমার এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা, কিন্তু এ প্রয়াসের সাফল্য সহজলভ্য নয়। নাদই ব্রহ্ম এ তত্ত্ব বুঝবার মত সাধক স্বল্প, বস্তুতঃ দুর্লভ বল্লেই চলে। দেখ না পরমহংসের মত ব্যক্তি, সেও কালী কালী ক'রে মূর্ত্তি পূজা করে।

রাখাল—শুধু ওঁ ওঁ কোরে চীৎকার কর্লেই কি ব্রহ্মলাভ হয় ?

মহিমা—নিশ্চয়, ঐ সব জবা বিল্বদল কি তুলসী চন্দন দ্বারা সাকারের অর্চ্চনায় কি হবে ? নাদই ব্রহ্ম, মন প্রাণ দিয়ে যদি কেউ প্রণব ধ্বনি উচ্চারণ করে তাহলে পরম পুরুষ ব্রহ্ম নিশ্চয় প্রকাশিত হন।

হাজরা—আপনার গুরুদেবের নাম কি চক্রবর্ত্তী মশায় ?

মহিমা—শ্রীশ্রীআগমাচার্য্য ডমরুবল্লভ। এবম্প্রকার সাধক অধুনা দুর্লভ। এক হুংকার ছাড়তেন আর সমাধিতে লীন হয়ে যেতেন।

লাটু—মৃগবাবু কেমন আসেন ?

মহিমা—আমার পুত্র শ্রীমান মৃগাঙ্কমৌলী পতিতুণ্ডির কথা জিজ্ঞাসা কোরছ ? সুস্থ আছে, তোমাদের সব কুশল তো ?

লাটু—জি হাঁ ; কুথা চল্লেন ?

মহিমা—শান্তি-শীতল পঞ্চবটীর বনচ্ছায়ায় ধ্যান ধারণা সমাপ্ত করে এখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করছি।

(ঠাকুরের প্রবেশ)

ঠাকুর—কি গো, কি হচ্ছে সব ? গোলক ধাম খেলছ ? চক্রবর্ত্তী যে, তা এখানে জাহাজ কেন ?

মহিমা—(বিস্ময়ে) জাহাজ ?

ঠাকুর—হ্যাঁগো ; তুমি যে বিদ্যা বুদ্ধির জাহাজ, এখানে তো ছোটখাট জেলে ডিঙ্গি আসে।

মহিমা—(উৎফুল্ল কণ্ঠে) ও তাই। স্থানটী বেশ সাধনোপযুক্ত, তাই সাধনায় আসি। এখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করছি এজন্য সাধনাসন খানি.........

ঠাকুর—আমার ঘরে রাখবে তো ?

মহিমা—হ্যাঁ বুঝতেই তো পারছেন, এ আসন ত যত্রতত্র রক্ষা করা যায় না।

ঠাকুর—বেশ তো দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখগে।

(ওঁ ওঁ করিতে কবিতে মহিমা চলিয়া গেলেন)

মস্ত পণ্ডিত সত্যিই বিদ্যাব জাহাজ ; কিন্তু অহং যায়নি। ও একটু সহজ হলেই ওর হবে। আমার ঘরে বাঘের ছালটা কেন রাখে জানিস ? যার। আমার ঘরে আসবে তারা জিজ্ঞাসা করবে বাঘ ছালটা কাব ? আমি বলব "মহিমা চক্রবর্ত্তীর"। তাহলে

পাঁচজন ভাববে সে মস্ত বড় সাধক, নাম ডাক হবে। যতই যা করো অহং না ছাড়লে কিছু হবে না। সুতোয় যদি ফেঁসো থাকে কিছুতেই ছুঁচের ফুটোয় গলবে না; এই অহং জ্ঞান হোল সেই ফেঁসো। কি রে রাখাল তোর কোন ঘর হোল?

রাখাল—লাটু বলছে আমায় সংসারে পড়তে হবে।

(লাটু খেলিল এবং তাহার সাত চিৎ হইল। সানন্দে হাততালি দিয়া সে ধেই ধেই করিয়া নাচিতে লাগিল)

লাটু—আমার সাত চিৎ, একেবারে গোলকধাম···মুক্তি।

ঠাকুর—নোটোর যে আহ্লাদ দেখ, ওর উটি না হলে মনে বড় কষ্ট হোত।

মাষ্টার—(খেলিল) আমারও গোলকধাম।

ঠাকুর—(ভবনাথকে) হ্যাঁরে, নরেন্দর অনেক দিন আসে নি। তোর কাছে ত সে প্রায় আসা যাওয়া করে, একদিন তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসিস না।

ভবনাথ—যে আজ্ঞা, তবে সে কি আসবে; সে যে ব্রাহ্ম সমাজে খুব যাতায়াত করে। সে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, আর আপনি ত মা কালীকে পূজা করেন; জানেন তো ব্রাহ্মরা পুতুল পূজাকে ঠাট্টা করে।

ঠাকুর—আসবে গো আসবে। মা যে দেখিয়ে দিয়েছেন, যাদের

এখানে আসবার কথা ও যে তাদের মধ্যে একজন। বেশ ছেলে ; গাইয়ে, বাজিয়ে, পড়াশোনায় যে দিকে দেবে একটা হুলুস্থুল বাধাবে।

(হাজরা খেলিতে তাহাব ঘুঁটি নরকে পড়িল।)

(হাজরাকে) কি হোল ?

লাটু—একেবারে নরকে পড়েসে।

(সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিশোরা খেলিল, তাহারও ঘুঁটি উঠিল।)

ঠাকুর—(কিশোরীকে) কি তোমারও বৈকুণ্ঠ লাভ হোল। ধন্য তোমরা

(মাষ্টার ও কিশোরীকে নমস্কার করিলেন। হাজরা চটিয়া ছক উল্টাইয়া উঠিয়া গেল।)

ঠাকুর—এর একটা মানে আছে। হাজরার বড় অহংকার এতেও আমার জিত হবে ; ঈশ্বরেবও এমন আছে যে, ঠিক লোকের কখনও কোথাও তিনি অপমান করেন না। সকলের কাছেই জয় ! আচ্ছা তোমরা এস (মাষ্টারকে) তুমি বোসো।

(অন্যান্য সকলে চলিয়া গেলেন।)

তুমি একটা ত ধরেছ, নিরাকার ?

মাষ্টার—আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে আপনি যেমন বলেন, সবই সম্ভব ; সাকারও সম্ভব।

ঠাকুর—এখন ঐ ভাবেই থাক। টেনে টুনে ভাব বদলে দরকার নাই। ক্রমে জানতে পারবে। বিদ্বেষ ভাব ভাল নয়। বৈষ্ণব, বৈদান্তিক এরা ঝগড়া করে, সেটা ভাল নয়। ব্যাকুলতা থাকলে সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়।

মাষ্টার—ঠিক ঠিক ব্যাকুলতা কিসে বোঝা যায় ?

ঠাকুর—কাজ গেলে কেরাণীর যেমন ব্যাকুলতা হয়; সে রোজ আফিসে ঘোরে আর জিজ্ঞাসা করে "হ্যাঁগা কোন কাজ খালি হয়েছে ?" ব্যাকুলতা হলে ছট্‌ফট্‌ করে, কিসে ঈশ্বরকে পাবো। কেউ যদি তোমায় জলে ডুবিয়ে ধরে তাহলে হাওয়ার জন্যে যেমন ধড়ফড় করো, ঈশ্বরকে পাবার জন্যে তেমনি ধড়ফড়ানিকে বলে ব্যাকুলতা। গোঁপে চাড়া, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আছেন, পান চিবুচ্ছেন, কোন ভাবনা নেই, এরূপ অবস্থা হলে ঈশ্বর লাভ হয় না। আচ্ছা, তোমার টাকা ঐশ্বর্য্য এতে টান আছে ?

মাষ্টার—না,···তবে নিশ্চিন্ত হবার জন্য—নিশ্চিন্ত হয়ে ভগবান চিন্তা করবার জন্য—।

ঠাকুর—তা হবে বৈকি।

মাষ্টার—লোভ নয় ?

ঠাকুর—হ্যাঁ,—তা বটে ; তা না হলে তোমার ছেলেদেব কে দেখবে ? তোমার যদি অকর্ত্তা জ্ঞান হয়, তাহলে ছেলেদের উপায় কি হবে ?

মাষ্টার—শুনেছি, আমি কর্ত্তা এই বোধ থাকতে জ্ঞান হয় না।

ঠাকুর—এখন ঐভাবে থাকো; তুমি আর বিচার এনো না।

(পুরাতন ব্রাহ্ম ভক্ত মণিলাল মল্লিক আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। তিনি ব্যবসায়ী, কাশীতে কুঠি আছে।)

ঠাকুর—কি গো, কাশী থেকে কবে এলে? হ্যাঁগা, কাশীতে গেলে, ভাল সাধু-টাধু দেখলে?

মণিলাল—আজ্ঞে হ্যাঁ, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ, এঁদের সব দেখতে গিয়েছিলাম।

ঠাকুর—কি রকম সব দেখলে, বল।

মণিলাল—ত্রৈলঙ্গ স্বামী সেই ঠাকুর বাড়ীতেই আছেন, মণিকর্ণিকা ঘাটে, বেণীমাধবের কাছে; লোকে বলে আগে তাঁর উচ্চ অবস্থা ছিল। কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য করতে পারতেন, এখন অনেকটা কমে গেছে।

ঠাকুর—ও সব বিষয়ী লোকের নিন্দে।

মণিলাল—ভাস্করানন্দ সকলের সঙ্গে মেশেন, ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মত নয়, তাঁর একেবারে কথা বন্ধ।

ঠাকুর—কিছু কথা হোল?

মণিলাল—জিজ্ঞাসা কোরলাম "ভক্তি কিসে হয়?" তিনি বল্লেন: নাম কর, রাম রাম বোলো।

ঠাকুর—এ বেশ কথা।

মণিলাল—আমি আজ আসি ; একটু তাড়া আছে।

(উঠিলেন)

ঠাকুর—দেখ, তুমি ত কোলকাতা ফিরবে ?

মণিলাল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঠাকুর—ঐ পথে বিশ্বনাথ দত্তের বাড়ী হোয়ে দেখে যেয়ো ত, তার ছেলে নরেন্দর কেমন আছে। অনেক দিন আসেনি, ভাবনা হচ্ছে অসুখ বিসুখ করেনি ত ?

মণিলাল—আজ্ঞে আচ্ছা, দেখে যাবো।

(মণিলালের প্রণামান্তে প্রস্থান।)

ঠাকুরও প্রস্থান করিলেন। মহেন্দ্র মাষ্টার অপর দিকে প্রস্থান করিলেন। পুনরায় ঠাকুর কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুর পায়চারি করিতেছেন আর কাতরস্বরে আপন মনে জগন্মাতার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

ঠাকুর—মা, মাগো, নরেনকে এনে দে মা। কেন সে আসেনা ? তাকে না দেখে আমি যে থাকতে পারিনা মা, বুকের ভেতরটা যে গামছা নিংড়োবার মত যন্ত্রণা হচ্ছে ; আমার এ টানটা সে কেন বোঝে না ? তাকে যে অনেক কাজ করতে হবে, তার মনটা এদিকে ঘুরিয়ে দে মা।.......

(কাঁদিতে লাগিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের প্রবেশ ও প্রণাম। নিজেকে সংযত করিয়া)

ছিঃ ছিঃ বুড়ো মিনসে ; তার জন্য এত অস্থির হচ্ছি, কাঁদছি দেখলে লোকেই বা কি বোলবে। তোমরা আপনার লোক, তোমাদের কাছে লজ্জা হয় না, কিন্তু অপরে দেখলে কি বলবে বলত ? কিন্তু কিছুতেই সামলাতে পারছি না।

বৈকুণ্ঠ—কার ওপর এ অহেতুকী কৃপা ?

ঠাকুর—আমাদের নরেন্দর কথা বলছি গো। কোলকাতা সহরে এমন শুদ্ধসত্ত্বগুণী কি করে এল, তাই ভাবছি ; আমি দেখেছি ও অখণ্ডের ঘরের চারজনের একজন, ওর কত গুণ!

বৈকুণ্ঠ—তাই ত মশায়, তার ত ভারী অন্যায়। তাকে না দেখে আপনার এমন কষ্ট হয় একথা জেনেও সে আসে না। কেমন লোক সে ?

ঠাকুর—ওগো, তোমাদের কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণর ভেতরে একটা জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলছে আর নরেন্দর ভেতরে জ্ঞান সূর্য্য জ্বল জ্বল কোরছে ; তার ভেতরে মায়ামোহের লেশ পর্য্যন্ত নাই। ও নিত্যসিদ্ধ ধ্যানসিদ্ধ। অন্যেরা কলসী ঘটী এসব হতে পারে, নরেন জালা।

বৈকুণ্ঠ—তবে সে আপনার কাছে আসে না কেন ?

ঠাকুর—আসবে আসবে, বড় শক্ত ছেলে। পরীক্ষা কোরছে, বিনা বিচারে ও কিছু নেয় না। ওর মনের মধ্যে ঝড় উঠেছে, আড়াইটে পাশ করেছে, ইংরাজী অনেক পড়েছে, তার ওপর ব্রাহ্ম সমাজে

নাম লিখিয়েছে ; তাই হিন্দুধর্ম্ম মানতে কষ্ট হচ্ছে। সেদিন রাখাল মায়ের সামনে প্রণাম কোরছে দেখে চটে অস্থির, তাকে বলে, তুমি ব্রাহ্ম সমাজে প্রতিজ্ঞা পত্র সই কোরেছ, অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বর' বই আর কিছু মানবে না, আর এখানে পাথরের পুতুলের সামনে মাথা নোয়াচ্ছ, এটী তোমার মিথ্যাচার ; রাখাল বেচারা ভাল মানুষ ; চোরের মত হোয়ে গেল।

বৈকুণ্ঠ—এ ত মহানাস্তিক মশায়। এর জন্যে আপনি এত উতলা হচ্ছেন।

ঠাকুর—মা যে দেখিয়ে দিয়েছেন, কিছুদিন পর ও সব সত্য বলে মানবে। ও হলো অখণ্ড ব্রহ্মচারী।

একজন অনেক ফলমূল, মিছরী, পেস্তা, বাদাম, কিসমিস সহ একটি রূপার থালা লইয়া প্রবেশ করিল।

কিরে ; ওসব কি !

লোক—আজ্ঞে একজন মস্ত বড় মাড়োয়ারী ভক্ত এগুলো এনেছেন আপনার সেবার জন্যে।

ঠাকুর—নিয়ে যা, নিয়ে যা, এখান থেকে নিয়ে যা। ওসব কামনায় ভর্ত্তি। সাধুকে একখিলি পান দিলেও, তার মধ্যে ষোলটি কামনা ওরা জুড়ে দেয় ; ঐ রকম সকাম দাতার অন্ন খেলে ভক্তির হানি হয়।

বৈকুণ্ঠ—আজ্ঞে ফেরৎ দিলে হয়ত তিনি দুঃখ পাবেন। তার চেয়ে আর কাউকে নয়ত ওগুলো দিয়ে দিন।

ঠাকুর—না গো না ; যে খাবে, ঐ কামনার বিষ তাকে গিলতে হবে। অপবিত্র ভোজনে শরীর আর মনের হানি হয়, (একটু ভাবিয়া) আচ্ছা ওগুলো রেখে দাও গে, নরেন্দর যদি আসে তাকে দিও।

বৈকুণ্ঠ—সে কি ! তাকে আপনি অত ভালবাসেন, আর যে জিনিষ কাউকে খেতে দেবেন না, তাই তাকে দেবেন ?

ঠাকুর—ওগো ও হোলো জ্ঞানের আগুন ; কোন দোষই ওকে স্পর্শ কোরতে পারবে না। শোর, গরু খেয়ে যদি কেউ ভগবানে মন রাখে তা হলে তা হবিষ্যান্নের তুল্য, আর শাকপাতা খেয়ে যদি কেউ বিষয় কামনায় ডুবে থাকে, তবে তা শোর, গরু খাওয়ার চেয়েও খারাপ।

লোক—আজ্ঞে নরেন বাবু কি আসবেন ?

ঠাকুর—তা আমি কি জানি রে শালা। কেন সে আসছে না, দেখগে না ; কাউকে তার কাছে পাঠিয়ে দে না—আমি যে আর থাকতে পারছি না। এ আমার কি কোরলি মা—তার জন্যে কেন মন এমন করে—ওরে আয় আয়—আর যে থাকতে পারছি না।

(উদ্‌ভ্রান্তের মত কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান। বৈকুণ্ঠ ও লোকের অনুসরণ।)

চতুর্থ দৃশ্য

ববাহনগরে ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়েব বৈঠকখানা। রাত্রিকাল। ভবনাথ, সাতকড়ি, দাশরথি ও অন্য একজন চৌকিতে বসিয়া তাস খেলিতেছে। সকলেই সমবয়সী। তাসের আড্ডার মধ্যে নরেন্দ্রনাথ প্রবেশ করিলেন।

দাশরথি—Here comes the hero ! কিহে এতদিন কোথায় ডুব মেরেছিলে ? কুস্তির আখড়ায় দেখি না, গানের মজলিসে দেখি না, ব্যাপার কি ?

সাতকড়ি—কারু প্রেমে-ট্রেমে পড়েছ না কি হে ? সব ছেড়ে এখন প্রেয়সীর শ্রীমুখপঙ্কজ চিন্তা কোরছ নাকি ?

নরেন্দ্র—যাদৃশী ভাবনা যস্য ; নিজের আয়নায় জগত দেখলে অমনি হয়।

সাতকড়ি—কি বাবা লুকোচ্ছ ? ব্যারিষ্টার আব, মিত্রের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা হোচ্ছে না ? দশহাজার টাকা, কোলকাতার বাড়ী আর সঙ্গে রূপসী ষোড়শী ; বল হাঁ কি না ?

নরেন্দ্র—কথা একটা হচ্ছে বটে, কিন্তু কাজে কিছু হবে না, সে দেখে নিও।

ভবনাথ—ভাই সেদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলুম, পরমহংসদেব ত দেখি

তোমার জন্যে ভারি আকুল। কেমন আছে, আসে না কেন, একবার পাঠিয়ে দিও, কত বার বললেন।

নরেন্দ্র—That magician! ভদ্রলোক hypnotism জানেন। প্রথম দিনই আমায় hypnotise করে ভেল্কি দেখিয়েছিলেন, প্রায় একমাস তার ঘোর কাটেনি।

দাশরথি—তবু যাও ত প্রায়ই শুনি।

নরেন্দ্র—প্রায় নয়, তবে মাঝে মাঝে যাই, তার কারণ কোথাও truth খুঁজে পাচ্ছিনা। ভদ্রলোকের সহজ সরল ব্যবহার বড় ভাল লাগে। যথেষ্ট পাগলামী আছে সত্যি, কিন্তু কেমন একটা আকর্ষণও আছে।

ভবনাথ—তা হলে তুমি স্বীকার কোরছ তোমার ইচ্ছাকেও তিনি তাঁর ইচ্ছা দিয়ে জয় কব্‌তে পাবেন—এইটাই কি কম শক্তি ?

নরেন্দ্র—সে কথা বলতে পার, তাঁব will power খুব বেশী।

ভবনাথ—সেইটাই ত সাধনার শক্তি। আমি দেখেছি টাকা পয়সা ছুলে ওঁর আঙ্গুল কুঁকড়ে যায়, ভাবের ঘোরে অনেক সময় ন্যাংটোব্যাংটো হয়ে পড়েন ; লাজলজ্জার হুঁস থাকে না।

সাতকড়ি—তা হলে সব পাগলই সাধু বল।

দাশরথি—আমি ত ভাই ভদ্রলোকেব মতের কোনও আদি অন্ত পেলাম না। সাধু যা হয় একরকম উপদেশ দেবেন ত ; তা নয়, কাউকে বলছেন "সংসার ছেড়ে পালা, কামিনী-কাঞ্চন মহাবিষ।"

শিষ্যের দলের কাউকে বলেন ঃ ভক্তিই একমাত্র পথ, নাম গান কর। আবার কাউকে বলেন—জ্ঞানেই মুক্তি, ধ্যান ধারণা কর।

ভবনাথ—সন্দেহ হলে জিজ্ঞাসা কর না কেন? উনি ত বলেন এখানে প্যালা দিতে হয় না। গেলে পয়সা বা মিষ্টি যখন লাগে না, তখন গিয়ে জিজ্ঞাসা কর না কেন?

দাশরথি—জিজ্ঞাসা করব কি; এমন একটি উপমা দেবেন যে সব প্রশ্ন চুপ হয়ে যাবে। বেশী চেপে ধরলে বলেন "আমি কি জানি 'মা' বললেন, মা দেখিয়ে দিলেন।"

নরেন্দ্র—একি আর যুক্তি? ভগবানকে চিন্তা কোরে কোরে ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হয়েছে, তার ফলে তিনি যখন তখন মাকে দেখেন আর মায়ের সঙ্গে প্রলাপ বকেন। আমি চাই truth—সত্য, ওসব পুতুলের পাগলামি ভাল লাগে না।

সাতকড়ি—তোমার ব্রাহ্ম আচার্য্যেরা কি বলেন? চোখ-টোখ বুঝলে ভগবানকে দেখা যায় না?

দাশরথি—আর' ব্রাহ্ম আচার্য্য! আজকাল শুনি আচার্য্য কেশব সেনের মত লোক—মহারাণী ভিক্টোরিয়া যাকে ডেকে কথা বলেন—তিনিও পরমহংস মশায়ের পাল্লায় পড়ে খোল করতাল নিয়ে ব্রহ্ম নাম করতে করতে এখন হরিনাম, কালীনাম সুরু করেছেন।

নরেন্দ্র—তাইত মাঝে মাঝে মনে হয়, এই সব বিদ্যাবুদ্ধির জাহাজ

যখন ঐ ভদ্রলোককে মানেন, তখন হয়ত ওঁর মধ্যে কোন বিশেষত্ব আছে ; কিন্তু ওঁর ঐ 'মা'—'মা' ভাল লাগে না।

ভবনাথ—'মা' 'মা" ও ভাল লাগে না, ব্রাহ্ম সমাজেও শান্তি পাচ্ছ না; তবে তোমার কি ভাল লাগে ?

নরেন্দ্র—সেইটাই ত বুঝতে পারছি না। মানুষ শুধু খাওয়া পরা আর সংসার করার জন্যে নিশ্চয় জন্মায় না, সে ত জানোয়ারেরাও করে; কাজেই তার বেশী কিছু তাকে কোরতে হবে ; কিন্তু কি যে কোরতে হবে, আর কি যে পথ, কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলোচনা করেছি, গির্জ্জার পাদ্রীদের জিজ্ঞাসা করে দেখেছি—আমার প্রশ্নের সঠিক জবাব কোথাও পাইনি ; ঈশ্বরকে দেখেছেন একথা কেউ বলতে পারেননি।

সাতকড়ি—শোন, আমার পরামর্শ নাও। You are a bright young man. এখন থেকে ঐ সব ঈশ্বরের খেয়াল ছেড়ে বিয়ে থা কর। বাপের ব্যবসায় ঢোকবার ব্যবস্থা কর, নইলে তোমারও ঐ রকম পাগলামো দেখা দেবে।

নরেন্দ্র—বাপের ব্যবসায়! বিয়ে! বাপরে! সংসারে নিজেকে জড়াচ্ছি না, খাওয়া পরার ভাবনা নেই তবু শান্তি পাচ্ছি না। এর ওপর যদি সংসারের চিন্তা মাথায় ঢোকে তা হলে পাগল হোয়ে যাব। দিব্যি আছি, বাপের হোটেলে খাচ্ছি আর যা খুশি করে বেড়াচ্ছি।

সাতকড়ি—যা খুসি মানে ত ঐ সব ধর্ম্মের পাগলামি। আজ এ সাধু, কাল অমুক আচার্য্য, পরশু আর এক পাদ্রী ; ও রকম ধূমকেতুর মত ছুটলে কখনও শান্তি মেলে !

দাশরথি—সাতকড়ি মন্দ বলেনি নরেন, ওরকম ছুটোছুটি না করে স্থির হয়ে বড় বড় জার্ম্মান, ইংরেজ দার্শনিকদের বইগুলি বরং পড়ে দেখ। সত্যিকার জ্ঞান পেতে হলে ইউরোপে খোঁজ ; এ দেশের ঐ সাধু টাধু ছাড়।

নরেন্দ্র—পড়ছি বইকি! কলেজের বই আর কখন পড়ি? ক্যাণ্ট, হেগেল, সপেনহর, স্পেনশার, স্পাইনোজা, ডারউইন সব পড়লাম, কিন্তু মনের দ্বন্দ্ব মিটছে না। যা এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাকে স্বীকার করে নেব, না স্বীকার করে নেব মহাপুরুষদের অসাধারণ প্রত্যক্ষকে ঠিক করতে পারছি না।

ভবনাথ—অর্থাৎ পাশ্চত্যের জড়বাদ সত্যি, না আমাদের চৈতন্যবাদ সত্যি—এইত ?

নরেন্দ্র—Exactly. বিজ্ঞান বলছে যে পৃথিবীর সব কিছু শক্তিকে সে নিজের আয়ত্বে আনতে পারে, আর ভারতের ধর্ম্ম বলছে জগতের সব কিছুর অন্তরালে আছে এক অসীম শক্তিমান পুরুষ, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হতে পারে না, তাঁরই ইঙ্গিতে সমগ্র জগত চালিত হচ্ছে। যত বই পড়ছি তত জিনিষটা আরও ঘুলিয়ে যাচ্ছে, অথচ যারা ধর্ম্মগুরু তারাও এর সহজ উত্তর দিতে পারছেন

না। শুধু বোলছেন, ধ্যান কর, যোগ কর; তাঁর কৃপা হোলে সব জানতে পারবে। তাঁর কৃপার জন্যই যদি অপেক্ষা কোরে বসে থাকবো তবে আর ধ্যান যোগের দরকার কি ?

ভবনাথ—আমি বলি কি, যাওনা একদিন দক্ষিণেশ্বর। পরমহংসদেবকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো, দেখবে সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে যাবে।

সাতকড়ি—হাতী ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল। দেখছ নরেন কি রকম বাঘা বাঘা পণ্ডিতগুলোকে হজম করেছে তবু ওর ক্ষিদে মিটছে না; আর তুমি পাঠাচ্ছ ওকে ঐ একটা ডাং মুখ্যু পূজোরী বামুনের কাছে সমাধান খুঁজতে। লোকটার ধ্যানট্যান করে কিছু তুকতাকের শক্তি হয়েছে শুনেছি. তাই কতকগুলো ইস্কুলের ছোঁড়ার মাথা ওখানে খাওয়া যাচ্ছে। বিদ্যাসাগর মশায়ের স্কুলের এক মাষ্টার ওখানে জুটেছে, সেইটে পাণ্ডা হোয়ে কতকগুলো কচি ছেলেকে ওখানে নিয়ে তাদের মাথাটি খাচ্ছে; তাই বলে নরেনের পাকা মাথা কি সে চিবুতে পারবে ?

ভবনাথ—জিজ্ঞাসা করো না পাকামাথা কেমন বন বন করে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন ?

সাতকড়ি—তাই নাকি নরেন ?

নরেন্দ্র—বলেছি ত hypnotism জানেন ভদ্রলোক। আমার গা ছুঁতেই কেমন hypnotised হোয়ে গিয়েছিলাম, যা দেখালেন তাই দেখলাম।

সাত্তিকড়ি—বলো কি! সত্যি?

নরেন্দ্র—হ্যাঁ, তবে মাথায় একটু ছিটও আছে—নইলে নিজে বলেন কিনা, আমি ঈশ্বরকে দেখেছি, আমি তার সঙ্গে কথা বলি।

দাশরথি—যাকগে ভাই পরনিন্দা; তাসের দফা ত নরেন এসে গয়া কোরলে, তার compensation স্বরূপ একখানা গান গাও।

নরেন্দ্র—জো হুকুম মহারাজ।

—গান—

(সুর:—মুলতান ঢিমা ত্রিতালী)

মুঝে বারি বনোয়ারী সৈঁইয়া
যানেকো দে।
যানেকো দেরে সৈঁইয়া
যানেকো দে (আজুভালা)॥
মেরা বনোয়ারী, বাঁদি তুহারি—
ছোড়ো চতুরাই সৈঁইয়া
যানেকো দে (আজুভালা)
(মোরে সৈঁইয়া)
যমুনাক নীরে, ভরোঁ গাগরিয়া
জোরে (১) কহত সৈঁইয়া
যানেকো দে।

(বেগে বন্ধু হেমালীর প্রবেশ)

---

(১) জোরে—করজোড়ে। গানটী স্বামীজীর স্বরচিত।

হেমালী—নবেন !

নরেন্দ্র—কে হেমালী ? তুমি এত রাত্রে ·····এখানে······এভাবে ?

হেমালী—অনেক খুঁজে তোমায় ধরেছি—শীগ্রী বাড়ী এস।

নবেন্দ্র—কেন কি হোয়েছে ?

হেমালী—তোমাব বাবার বড অসুখ, আছেন কি না সন্দেহ।

সকলে—সে কি !

নবেন্দ্র—আজও ত কোর্টে গিয়েছিলেন ; কি হোযেছে ?

হেমালী—কোর্ট থেকে ফিরে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন, তারপর রাত্রি দশটায়—

(কাঁদিয়া ফেলিল)

নবেন্দ্র—এঁ্যা ! বাবা নেই ! বাবা বাবা·········ওঃ ভগবান, একি কোবলে ! মুক্তি...মুক্তি, আমি যে মুক্তি চেয়েছিলাম······এই কি মুক্তি ?

(ক্রন্দন)

যবনিকা

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নরেন্দ্রনাথের বাড়ীর অলিন্দ, নরেন্দ্র বাহিরে যাইবার
বেশে গমনোদ্যত ; এমন সময় মাতা ভুবনেশ্বরী
প্রবেশ করিলেন।

ভুবনেশ্বরী—হ্যাঁরে বিলে, এই দুপুর রোদে আবার কোথায় বেরুচ্ছিস ? এই ত সারা সকালটা টো টো করে এলি।

নরেন্দ্র—রোদ ! রোদ বৃষ্টি মানলে চলে মা ! এখন কি আর বাবার আমল আছে যে তোমার বিলে জুড়ীগাড়ী কোরে বেরুবে।

ভুবনেশ্বরী—তা বলে শরীরটা ত দেখতে হবে, চাকরীর চেষ্টায় শরীরটা যে কালি হোল, আয়নায় একবার চেহারাটা দেখেছিস ?

নরেন্দ্র—মা, যে ভাই-বোনদের মুখে দুটো অন্ন দিতে পারে না সে কি ঘরে বসে আয়নায় মুখ দেখবে ? মাঝে মাঝে মনে হয় আমার মত অপদার্থের মরাই ভাল।

ভুবনেশ্বরী—ষাট ষাট, অমন কথা বলে !

নরেন্দ্র—নয় কেন মা ? বাবার মৃত্যুর পর তোমাদের কি দশা হোল ! যার বাড়ীতে দিনে অন্ততঃ একশো পাতা পড়ত, দশবিশটা দাসদাসী যার হুকুম তামিল কোরত, জুড়ীগাড়ী ছাড়া কখনও

যে রাস্তায় চলেনি, মাসে হাজার টাকার কম যাদের সংসার চোলত না, তাদের আজ অন্নাভাব। কাল কি খাবে তার চিন্তা কোরতে হয়। অথচ আমি তোমার বড় ছেলে এখনও বেঁচে!

ভুবনেশ্বরী—ছিঃ বিলে ওকথা বলতে নেই, আমাদের এ অবস্থার জন্য তুই ত দায়ী নস্। সঞ্চয় করা তাঁর স্বভাব ছিল না; তাঁর ঋণের দায়ে সব গেল, তা তুই কি করবি? তা হ্যাঁরে, এত চেষ্টা করছিস কোন চাকরীই জোগাড় করতে পারলি না? ওঁর ত অনেক আলাপী লোক ছিল।

নরেন্দ্র—তাদেব কথা বোল না মা, তাদের গায়ে শুধু মানুষের চামড়া-খানাই আছে; যাঁরা বাবাব দয়া ভিক্ষে করে ফি ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে, যারা তাঁর চেষ্টায় বহু টাকাব সম্পত্তিব মালিক হোয়েছে, তাবা আজ আমায় চিনতেই চায় না। এমন কি যারা বাবার কাছে ঋণ নিয়েছিল তাবাও যেন সে কথা ভুলে গিয়েছে। জানে এদের অবস্থা খারাপ, টাকা আদায়েব শক্তি নেই। বড় চাকরী নয় মা, মাসে ৪০৲—৫০৲ টাকা মাইনের চাকরীও চেষ্টা করে পাচ্ছি না।

ভুবনেশ্বরী—পবকেই বা কি দোষ দেব বাবা। যাবা নিজেদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তারাই যখন তিনি চোখ বুজতে না বুজতে এ বাড়ীর অংশ দাবী কোরে মামলা কোরতে পারলে, তখন বাইরের লোক যে এমন কোরবে তার আর আশ্চর্য্য কি?

নরেন্দ্র—এই হোল সংসার মা! এদের জন্যই বাবা কতই না কোরেছেন। বাবার আমলে যারা তাঁর এই বাড়ীতে বসে তাঁর অন্ন ধ্বংস কোরেছে আজ আমাদিগকে ভিটেমাটী ছাড়াবার জন্যে তারাই উঠে পড়ে লেগেছে। এই সংসারের এত মায়া! সংসারের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে মা, মাঝে মাঝে মনে হয় ঠাকুর্দ্দার মত সন্ন্যাসী হয়ে যাই।

ভুবনেশ্বরী—তা যাবি বৈকি। দায়িত্ব পালন না করে ঝেড়ে ফেলাই ত পৌরুষের কাজ। শিবের কাছে মানত কোরে তোকে পেয়েছিলাম; তা তিনি নিজে না এসে তাঁর নন্দী-ভৃঙ্গীর একটাকে পাঠিয়েছেন। তাই তোর অমন বুদ্ধি।

নরেন্দ্র—(সাদরে) মাগো, তাইত আমার হাতে পড়ে তোমাদের এত দুর্গতি। সত্যি বলছি মা, বাবা যদি বেঁচে থাকতেন, তোমাদের দায়িত্ব যদি আমার ওপর না আসতো, আমি সন্ন্যাসী হোয়ে যেতাম। মাঝে মাঝে ভগবানকে জানবার জন্যে আমার প্রাণটা কেমন আকুলি বিকুলি করে—

ভুবনেশ্বরী—থাম্ ছোড়া! ভগবান্! তোর ভগবান ত সব কোরলেন। ছেলেবেলা থেকেই ত তোর ভগবান ভগবান—এই কি তার ফল?

নরেন্দ্র—সত্যি মা, এক এক সময় মনে হয় এসব বুজরুকী, সব মিথ্যে; জগতে যা কিছু ঘটছে নেহাতই দৈবাৎ। আর সত্যি

যদি কেউ থাকে যে এই জগৎকে চালাচ্ছে সে কখনও মঙ্গলময় নয়। সত্য, ন্যায়, ধর্ম্ম এ সবের কোন মূল্য নেই তার কাছে। নইলে যারা অন্যায় কোরছে, অধর্ম্ম কোরছে তাদেরই দেখ বাড়বাড়ন্ত ; আর যারা সৎভাবে বাঁচতে চায় তারা পদে পদে লাঞ্ছিত। বাঁচবার পথ তারা খুঁজে পায় না।

(জনৈক লোকের প্রবেশ ; বাজার সরকার গোছের চেহারা, সঙ্গে আরও ২।৩ জন তরিতরকারীর ঝুড়ি, ময়দার বস্তা, ঘিয়ের টীন প্রভৃতি লইয়া)

লোক—মশায় এটা কি নরেন্দ্র দত্তর বাড়ী ?

(ভুবনেশ্বরী চলিয়া গেলেন না— মাথায় কাপড় দিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন)

নরেন্দ্র—হ্যাঁ ; কি দরকার ?

লোক—ওঃ আপনিই, বেশ বেশ। ওরে নামা নামা, এখানেই নামা। আহা ময়দার বস্তাটা নীচে নামাসনি, দাওয়ায় রাখ। ওরে মাছের ভারটা নিয়ে কোথায় গেলি ?

নরেন্দ্র—ব্যাপার কি ? এ যে একেবারে রাজসূয় যজ্ঞের ব্যবস্থা দেখছি।

লোক—হেঁ হেঁ হেঁ ; আমাদের রাণীমা কি যে সে লোক। তাঁর দান কি যেদো মেধোর মত হবে মশাই। বছরে ছ'লাখ টাকা নিট মুনাফা ; ছেলেপুলে নেই ; কে খায় মশায় ? তাই আপনার

অবস্থার কথা শুনে তিনি এই সামান্য সিধে পাঠিয়ে দিলেন। হ্যাঁ আর এই চিঠিটি দিয়েছেন।

(চিঠি দিলেন, নরেন্দ্র পড়িয়া ক্রোধে)

নরেন্দ্র—নিয়ে যাও, এসব নিয়ে যাও। শীগ্রী নিয়ে যাও এখান থেকে। দয়া! দান! আমার অবস্থার জন্যে অনুকম্পা! ওঠাও সব।

ভুবনেশ্বরী—ছিঃ বিলে, নিজের দম্ভে অপরের দানকে অমর্য্যাদা কোরতে নেই। তিনি যখন দয়া কোরে দিয়েছেন সসম্মানে গ্রহণ কর। তারপর মর্য্যাদায় বাধে নিজে গিয়ে বুঝিয়ে ফেরৎ দিয়ে আয়।

নরেন্দ্র—না মা, তুমি জানো না। এ দান নয় দয়া নয়। এ বিষ, এ মহাপাপ। যাও যাও, বেরোও বলছি। এখনও যদি না যাও একটি থাপ্পর খাবে।

লোক—ঐ ঐ আচ্ছা লোক ত আপনি! একটু ভদ্রতা জ্ঞানও নেই, বড় ঘরের ছেলে আপনি, অভাবে পড়েছেন শুনে রাণীমা দয়া কোরে সিধে পাঠিয়ে দিলেন আর আপনি তা এমনি গোঁয়ারের মত ফিরিয়ে দিচ্ছেন?...সমস্ত জিনিষটা ভাল কোরে বুঝে দেখুন।...হেঁ হেঁ হেঁ,...ছ'লাখ টাকা মুনাফা...

নরেন্দ্র—আর যদি একটি কথা বোলেছ, ত এক থাপ্পড়ে তোমার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দোব—

লোক—তা মশাই গিয়ে কি বোলব ? কেন নিলেন না, কি বৃত্তান্ত এই চিঠির জবাবে এক কলম লিখে দিন না ; নইলে সেখানে গিয়েও ত এমনি মধুর সম্ভাষণ পাবো।

নরেন্দ্র—

(সামনের একটা ঝুড়িতে সজোরে লাথি মারিয়া)

বলো এমনি কোরে তার জিনিষ ফিরিয়ে দিয়েছি ; আর তার চিঠির প্রস্তাবেরও ঐ এক উত্তর।

ভুবনেশ্বরী—ছিঃ ছিঃ, বিলে ; এখনও তুই তেমনি গোঁয়ার। এসব কি হচ্ছে ?

নরেন্দ্র—মা, এই জায়গাটায় গঙ্গাজল দিও। যাও, নিয়ে যাও এসব—বেরোও।

(লোকেরা চলিয়া গেল।)

ভুবনেশ্বরী—কি ব্যাপার কি ? কে এই রাণী মা ?

নরেন্দ্র—এই পাড়ারই এক বড় লোকের বিধবা বৌ। অল্প বয়েস, আমায় মাঝে মাঝে ডেকে পাঠাত, ভাবতাম বোধ হয় ধর্ম্ম আলোচনা করতে চায় ; কিন্তু শেষে তার চালচলন ভাল লাগে নি—তাই আর যেতাম না।

ভুবনেশ্বরী—হুঁ—চিঠিতে কি লিখেছে ?

নরেন্দ্র—আমার অভাবের সুযোগে প্রলোভন দেখিয়েছে মা। লিখেছে—"আমার জিনিষের সঙ্গে আমাকে ও আমার সকল

সম্পত্তি গ্রহণ করে আমাকে ধন্য কর; তোমার সকল দুঃখের অবসান করো।" ছিঃ, ছিঃ, কি পাপ, কি মহাপাপ আমাদের সমাজে ঢুকেছে!

ভুবনেশ্বরী—(আশীর্ব্বাদ করিয়া) বেঁচে থাক বাবা, আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তুই জীবনে বড় হবি। ভগবান তোর মঙ্গল নিশ্চয়ই কোরবেন। আমার অভাবের সংসার হোক, কিন্তু এ পুণ্যের সংসার, এই আমার সবচেয়ে আনন্দ।

(নরেন্দ্র প্রণাম করিল।)

নরেন্দ্র—আমি আসছি মা। বেরোবার সময় একটা অযাত্রা হোল আর কি—

ভুবনেশ্বরী—তা এ বেলা না হয় আর নাই বেরুলি। এত বেলায় না খেয়ে কি বেরোয়? বেরুতে যদি হয়ই দুটো ভাত মুখে দিয়ে যা।

নরেন্দ্র—না মা, আজ ত বাড়ীতে খাবো না। তোমায় বলতে ভুলেছি, আমার যে আজ এক বন্ধুর বাড়ীতে নেমন্তন্ন আছে।

(যাইতে যাইতে স্বগতঃ)

এই মিথ্যা ভাষণ ক্ষমা করো ভগবান। ছোট ছোট ভাই বোনদের মুখের গ্রাসে আর কতদিন ভাগ বসাবো।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

ঠাকুর নিজের ঘরে ছোট খাটটীতে বসিয়া ঈশ্বরের নাম করিতেছেন।
ঘরে প্রদীপ জলিতেছে, ধুনা দেওয়া হইয়াছে।
মণি মেঝেতে বসিয়া। ঠাকুর
গান গাহিলেন।

—গান—

আর ভুলালে ভুলবো না মা
দেখেছি তোমার রাঙ্গা চরণ
ওরে হেলবো না তুলবো না মা
বিষয়ে আসক্ত হোয়ে বিষের কূপে উলবো না মা।
সুখ দুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুন জ্বালবো না মা,
আশা বায়ুগ্রস্থ হয়ে মনের কথা খুলবো না মা,
মায়া পাশে বদ্ধ হয়ে প্রেমের গাছে ঝুলবো না মা।
রামপ্রসাদ বলে দুঃখ পেয়েছি, ঘোলে মিশে
ঘুলবো না মা॥

মণি—আচ্ছা আপনি সেদিন বিদ্যাসাগর মশায়কে কেমন দেখলেন?

ঠাকুর—ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের সব প্রস্তুত। কেবল চাপা রয়েছে। কতকগুলি সৎকাজ কোরছে; কিন্তু অন্তরে কি আছে, তা জানে না। অন্তরে সোনা চাপা রয়েছে।

মণি—কিন্তু খুব পণ্ডিত, দয়ালু আর মাতৃভক্ত। অত বড় কর্ম্মী এ যুগে দেখা যায় না।

ঠাকুর—সৎকর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে কোরলে ঈশ্বরে ভক্তি ভালবাসা আসে, ঈশ্বর লাভ হয়।

মণি—আচ্ছা, ঈশ্বরকে দর্শন এই চোখে হয় ?

ঠাকুর—না, তাঁকে চর্ম্ম চোক্ষে দেখা যায় না। সাধনা করতে করতে একটা প্রেমের শরীর হয়—তার প্রেমের চোখ, প্রেমের কান। সেই চোখে তাঁকে দেখা যায়—সেই কানে তাঁর বাণী শোনা যায়।

(মণি হাসিল।)

(সহাস্যে) হাসছো যে ?

মণি—ব্রহ্মের কি রূপ আছে ? তিনি ত অবাঙ্মনসোগোচরম, কাজেই তাঁকে কি করে দেখা যাবে ?

ঠাকুর—আছে গো, তিনি শুদ্ধমন শুদ্ধবুদ্ধির গোচর। তিনি সাকার-বাদীর কাছে সাকার—আবার নিরাকারবাদীর কাছে নিরাকার। ব্রহ্ম যখন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকেন তখন তাঁকে শুদ্ধ ব্রহ্ম বলে, আবার যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন তখন তাঁর শক্তির কাজ বলে। কিন্তু ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন আগুন আর তার দাহিকা শক্তি ; দুধ আর দুধের ধবলত্ব, জল আর তার হিমশক্তি। আমায় সব ধর্ম্ম একবার করে নিতে হয়েছিল—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান। আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত এসব

পথ দিয়েও আসতে হয়েছে। দেখলাম সেই এক ঈশ্বর, তাঁর কাছে সকলে আসছে—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে। একই পুকুরের আলাদা আলাদা ঘাট দিয়ে সবাই জল নিচ্ছে। কেউ বলছে—water, কেউ বলছে পানি, কেউ বলছে জল—নাম আলাদা কিন্তু জিনিষ একই। চাই ব্যাকুলতা।

মণি—পথ ভুলও ত হতে পারে ?

ঠাকুর—তিনি ত' অন্তর্য্যামী। ভুল পথে গিয়ে পড়লেও দোষ নাই। যদি ব্যাকুলতা থাকে, তিনিই আবার ঠিক পথে তুলে নেন্।

মণি—গীতায় আছে "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।" তিনিই সব করাচ্ছেন। তবে আমার কর্ম্মফলে আমি ভুগি কেন ?

ঠাকুর—লঙ্কা মরিচ খেলে পেট জ্বালা করবেই। তিনিই বলে দিয়েছেন যে খেলে পেট জ্বালা করবে। পাপ করলে তার ফলটি পেতে হবে।

মণি—পাপ যখন খারাপ তখন ভগবান পাপ সৃষ্টি করলেন কেন ? আর তিনিই যখন পাপ সৃষ্টি কোরেছেন তখন পাপ কোরলে পাপীর অপরাধ হবে কেন ?

ঠাকুর—সবই তাঁর লীলা। অন্ধকার না থাকলে আলোর মহিমা বোঝা যায় না ; দুঃখ না থাকলে সুখ বোঝা যায় না। মন্দ জ্ঞান থাকলে তবে ভাল জ্ঞান হয়। দেখ আমের খোসাটী আছে

বলে তবে আমটি বাড়ে ও পাকে। আমটি তয়ের হয়ে গেলে, তবে খোসা ফেলে দিতে হয়। মায়ারূপ ছালটা থাকলে তবেই ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। তোমার এক ছটাক বুদ্ধি নিয়ে তার লীলার কি বিচার কোরবে? এক সেরা ঘটীতে কি দশ সের জল ধরে? কাম কাঞ্চন যত নষ্টের মূল, আবার দেখ এই কাম দিয়েই তিনি সৃষ্টিধারা বজায় রাখছেন।

(মাষ্টারের প্রবেশ ও প্রণাম)

এস, এস। হ্যাঁগা, নরেন্দর বড় কষ্ট। বাপ মারা যাওয়ার পর মাঝে মাঝে আসে যায় বটে, কিন্তু এদিকে মন দিতে পারে না— ওর একটা উপায় হচ্ছে না।

মাষ্টার—আজ্ঞে হ্যাঁ; চেষ্টা খুব করছে; কিছু হচ্ছে না।

ঠাকুর—তিনি কখনও সুখে রাখেন—কখনও দুঃখে।

মাষ্টার—আজ্ঞে, ঈশ্বর দয়া নিশ্চয় করবেন।

ঠাকুর—(সহাস্যে) আর কখন করবেন! কাশীতে অন্নপূর্ণার বাড়ী কেউ অভুক্ত থাকে না বটে, কিন্তু কাউকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসে থাকতে হয়। ও ত' এবার পাশ দিয়েছে?

মাষ্টার—আজ্ঞে হ্যাঁ। বি, এ পাশের পরই ওর বাপ মারা যান। ও কিন্তু দুঃখের চাপে ক্রমশঃ নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে। যত সব নাস্তিক মতের বই পড়ছে।

ঠাকুর—ঈশ্বরের কাজ কিছু বোঝা যায়না। ভীষ্মদেব শরশয্যায় শুয়ে ; পাণ্ডবেরা দেখতে এসেছেন, সঙ্গে কৃষ্ণ। খানিকক্ষণ পরে দেখেন ভীষ্ম কাঁদছেন। পাণ্ডবেরা কৃষ্ণকে বল্লেন, কি আশ্চর্য্য ! পিতামহ অষ্টবসুর এক জন, এঁর মত জ্ঞানী দেখা যায় না ; ইনিও মৃত্যুর সময় মায়াতে কাঁদছেন। কৃষ্ণ বল্লেন, ভীষ্ম সে জন্য কাঁদছেন না। ওঁকে জিজ্ঞাসা কর দেখি। জিজ্ঞাসা করায় ভীষ্ম বল্লেন, কৃষ্ণ, আমি এই জন্য কাঁদছি যে সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎ নারায়ণ ফিরছেন কিন্তু পাণ্ডবদের বিপদের শেষ নেই। এই কথা যখন ভাবি, দেখি যে তোমার কাজ কিছুই বোঝবার যো নাই।

মাষ্টার—আজ্ঞে আপনি বলেন নরেন্দ্রের ভেতর জ্ঞানসূর্য্য জ্বলছে, ও খুব শুদ্ধাত্মা ; তবে এ নাস্তিক ভাব ওর কেন এলো ?

ঠাকুর—অবিশ্বাসও ঈশ্বরকে পাবার একটা পথ। তাঁকে জানবার জন্যে ওর মনে ব্যাকুলতা জেগেছে—তাই নেতি নেতি করে দেখছে।

মাষ্টার—শুনেছি ও বইপত্তর সব ফেলে দিয়েছে। বলে, ও সব বাজে। সকলকে ডেকে বলে ঈশ্বর নেই।

ঠাকুর—বেশ হয়েছে। গ্রন্থ যত পোড়বে ততই মনে গ্রন্থি পড়বে। বেশী বিচার ভাল নয়। পুকুরের জল ওপরে ওপরে খাও—পরিষ্কার জল পাবে। বেশী ঘাঁটতে গেলে জল ঘুলিয়ে যায়। ঈশ্বরকে ও খুঁজছে কিন্তু পাচ্ছে না। তাইত বলছে ঈশ্বর নেই। কিন্তু ক'জন তার মত ঈশ্বরকে খোঁজে ?

মাষ্টার—ও যে এখনও সাকার মানতে চায় না। আবার নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মও মানে না। ও বলে ব্রহ্ম সগুণ কিন্তু নিরাকার।

ঠাকুর—যত মত ততই পথ! ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। শুধু চাই ব্যাকুলতা আর নিষ্ঠা। নানা মত কি রকম জানো? বাড়ীতে মাছ এসেছে। মা সেই মাছে ঝোল, অম্বল, ভাজা আবার পোলাও করলেন। সকলের পেটে কিছু পোলাও সয় না। তাই যারা পেটরোগা তাদের জন্যে মা মাছের ঝোল করলেন, আবার কোন ছেলের সাধ অম্বল খায় বা মাছ ভাজা খায়। সব মত, সব ধর্ম্ম সবার জন্য নয়, তাই মা নানা মত, নানা ধর্ম্ম করেছেন। যার পেটে যা সয়। ধর্ম্ম আর ঈশ্বর এক নয়। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম আশ্রয় করে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। তাই এক এক ধর্ম্ম ঈশ্বরকে পাবার এক একটা পথ মাত্র।

(মহেন্দ্র একটি মোড়ক হইতে একটি লংক্লথ ও একটি জিনের জামা বাহির করিয়া দিলেন)

মহেন্দ্র—আপনার জামা।

ঠাকুর—এ দুটো কেন গা? তোমায় কি রকম জামা আনতে বলেছিলাম?

মহেন্দ্র—আজ্ঞে…আপনি সাদাসিধা জামার কথাই বলেছিলেন; জিনের জামা আনতে বলেন নাই।

ঠাকুর—তবে জিনেরটা ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তুমিই পরবে।

মহেন্দ্র—আজ্ঞে তাকি হয়!

ঠাকুর—তাতে দোষ নাই। হ্যাঁগা, তোমরা যারা এখানে আসো তাদের কি কিছু কিছু হচ্ছে?

মাষ্টার—আজ্ঞে হ্যাঁ হচ্ছে বৈকি।

ঠাকুর—কেমন করে জানলে?

মাষ্টার—(সহাস্যে) সবাই বলে এখানে যারা আসে তারা আর ফেরে না। গিরিশ ঘোষ ত সবে যাতায়াত শুরু করেছেন। তিনিও আজকাল অনেক রকম দেখেন। এখান থেকে গিয়ে অবধি সর্বদা ঈশ্বরের ভাবে থাকেন। কত কি দেখেন।

ঠাকুর—তা হতে পারে। গঙ্গার কাছে গেলে অনেক জিনিষ দেখা যায়, নৌকো, জাহাজ কত কি!

মাষ্টার—গিরিশ ঘোষ বলেন "এবার কেবল কর্ম্ম নিয়ে থাকবো। সকালে ঘড়ি দেখে দোয়াত কলম নিয়ে বসব আর সমস্ত দিন বই লিখব।" বলেন কিন্তু পারেন না। আমরা গেলেই কেবল এখানকার কথা।

ঠাকুর—(মাষ্টারকে) দেখ তারককে বাড়ীর লোক এখানে আসতে দেয় না, মা বাপ খুব বকে।

মণি—তবে ত মুস্কিল। যদি কারু মা বলে তুই ওখানে যাস্‌নে—যদি যাস্ তবে আমার রক্ত খাবি—কি অমনি দিব্যি দেন তবে?

ঠাকুর—যে মা ওকথা বলে সে মা নয়—সে অবিদ্যারূপিণী। সে মার কথা না শুনলে কোন দোষ নাই। ঈশ্বরের জন্য গুরুজনের বাক্য লঙ্ঘনে দোষ নাই। ভরত রামের জন্য কৈকেয়ীর কথা শোনে নাই। গোপীরা কৃষ্ণ দর্শনের জন্য পতিদের মানা শোনে নাই। বিভীষণ রামকে পাবার জন্য জ্যেষ্ঠ ভাই রাবণের কথা শোনে নাই। তবে "ঈশ্বরের পথে যেও না" এ কথা ছাড়া অন্য কথা শুনতে হয়। পলটুকেও তার বাবা এখানে আসতে বারণ করে। পূর্ণও ত লুকিয়ে চুরিয়ে আসে। এই সব নিষ্কলুষ আধার, এদের কি আমি ছেড়ে দিতে পারি ?

মণি—আপনি ছেলেদেরই বেশী কৃপা করেন দেখছি।

ঠাকুর—ওগো ছেলেবেলায় তাদের মন ষোল আনা নিজের কাছে থাকে, ক্রমে ভাগ হয়ে যায়। বে' হলে আট আনা স্ত্রীর ওপর যায়, ছেলে হলে আর চার আনা যায় ; বাকী চার আনা মা, বাপ, মান সম্ভ্রম, বেশভূষা, এইসবে চলে যায়। ছেলেরা ঈশ্বর লাভের চেষ্টা কোরলে সহজে তাঁকে পাবে। বুড়োদের হওয়া বড় কঠিন। কাঁচা মাটীতে গড়ন হয়, পোড়া মাটীতে আর গড়ন চলে না।

মণি—সে দিন শুনলাম অধরবাবুর বাড়ীতে বঙ্কিম চাটুজ্জে মশাই আপনাকে নাকি যাচাই করতে এসেছিলেন।

ঠাকুর—কি জানি বাপু কেন এসেছিলেন। অধর ত বল্লে মস্ত হাকিম —আর অনেক বইটই লিখেছে।

মণি—কিছু কথাবার্ত্তা হোলো ?

ঠাকুর—হ্যাঁ, অনেক কথা বল্লে। অনেক বিচার কল্লে। কিন্তু বিচারে তাকে জানা যায় না—বিশ্বাস চাই। নেমন্তন্ন বাড়ীর শব্দ কতক্ষণ শোনা যায় ? যতক্ষণ লোক খেতে না বসে। যাই লুচি তরকারী পড়ল, বারো আনা শব্দ কমে গেল।

(সকলের হাস্য)

অন্য খাবার পড়লে আরও শব্দ কমতে থাকে ; দই পাতে পড়লে কেবল সুপসাপ। ক্রমে খাওয়া হয়ে গেলে নিদ্রা। ঈশ্বরকে যত লাভ করবে তত বিচার কমে যাবে। তাঁকে লাভ হলে আর বিচার—শব্দ থাকে না। তখন নিদ্রা—সমাধি ।

(ছোট নরেনের প্রবেশ ও প্রণাম)

কিরে তুই কেন আবার এসেছিস ? সে দিন অত মেরেছে বাড়ীর লোক !

ছোট নরেন—আমি একবারে এখানে এসে থাকবো।

(হাস্য)

ঠাকুর—দেখ হাসি দেখ—কেমন ন্যাকা ন্যাকা হাসে। কিন্তু মনের ভেতর কিচ্ছু নেই। তিনটেই মনে নেই—জমিন, জরু, রুপেয়া। দেখি, তোর হাতটা দেখি।

(হাতটা কনুই পর্য্যন্ত নিজের হাতে ধরিয়া যেন ওজন পরীক্ষা করিয়া বলিলেন)

আসিস্ এক একবার ; তোর হবে। আচ্ছা তুই কি ভালবাসিস? জ্ঞান না ভক্তি ?

ছোট নরেন—শুধু ভক্তি।

ঠাকুর—না জানলে ভক্তি কাকে করবি ? (মাষ্টারকে দেখাইয়া) এঁকে যদি না জানিস, কেমন করে এঁকে ভক্তি করবি ? দেখি তোর শরীর, জামা খোল দেখি।

(ছোট নরেন জামা খুলিল)

বেশ বুকের ছাতি, হবে হবে। বিশ্বাস কর, নির্ভর কর, তাহলে নিজের কিছু করতে হবে না ; মা কালী সব করবেন। (মাষ্টারকে) হ্যাগা পূর্ণকে তুমি এসব শেখাচ্ছ ত ?

মাষ্টার—আজ্ঞে হাঁ।

ঠাকুর—(ছোট নরেনকে) সত্য কথা কলির তপস্যা। কলিতে অন্য তপস্যা কঠিন। সত্যে থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায়। (মাষ্টারকে) পল্টুকে আর একদিন নিয়ে এসো। (মণিকে) জানো, এ হোল হেডমাষ্টার, সবাই নাম দিয়েছে ছেলেধরা মাষ্টার। (ছোট নরেনকে) তুই বাপ মাকে খুব ভক্তি করবি, কিন্তু ঈশ্বরের পথে বাধা দিলে মানবি না। খুব রোক আনবি—

ছোট নরেন—আমার কিছু ভয় হয় না।

ঠাকুর—

—গান—

বিপদ ভয় বারণ যে করে, ওরে মন, তাঁরে কেন ডাকনা,
মিছে ভ্রমে ভুলে, সদা রয়েছ ভব ঘোরে মজি, একি বিড়ম্বনা।
এ ধন জন না রবে হেন, তাঁরে যেন ভুলোনা।
ছাড়ি অসার, ভজহ সার, যাবে ভব যাতনা।
এখন হিত বচন শোন, যতনে করি ধারণা।
বদন ভরি নাম হরি সতত কর ঘোষণা।
যদি এ ভবে পার হবে, ছাড় বিষয় বাসনা।
সঁপিয়ে তনু, হৃদয় মন, তাঁর কর সাধনা।

(গান শুনিতে শুনিতে ছোট নরেন গভীর ধ্যানে মগ্ন, যেন কাষ্ঠপুত্তলিকা)

দেখ, দেখ কি গভীর ধ্যান! একেবারে বাহ্যশূন্য। কামিনী কাঞ্চনের ছায়া মাত্র পড়েনি কিনা।

(হাত জোড় করিয়া ছোট নরেনের প্রতি)

নমো নারায়ণায়। তোমায় প্রণাম।

তৃতীয় দৃশ্য

গড়ের মাঠ। ক্লান্ত ভাবে অবসন্ন দেহে নরেন্দ্রের প্রবেশ, পায়ে জুতা নাই, পরণে মোটা কাপড়। দারিদ্র্যের চিহ্ন মুখে চোখে, বেশভূষায় সুস্পষ্ট।

নরেন্দ্র—ওঃ ঐশ্বর্য্যময়ী কোলকাতা, কি নিষ্ঠুর! চারিদিকে এই প্রাচুর্য্য, অর্থের অপচয় অথচ তারই পাশাপাশি দারিদ্র্যের কি নির্ম্মম করাল মূর্ত্তি! দরিদ্র ক্ষুধার্ত্তের দিকে কেউ মুখ ফিরিয়ে দেখে না। দয়া দেখিয়ে মুখের একটা মিষ্টি কথাও কেউ বলে না। ক'দিন থেকে ত মা একবেলা বাঁধতে আরম্ভ করেছেন; এর পব হয়ত হাঁড়িই চড়বে না। আর নিজেই বা নিমন্ত্রণ আছে বলে রাস্তার কলের জল খেয়ে কতদিন কাটাবো!

(ভবনাথেব প্রবেশ)

ভবনাথ—আরে কে নরেন যে! আছ কেমন? একি চেহারা হয়েছে তোমার?

নরেন্দ্র—এখনও যে বেঁচে আছি এই ত আশ্চর্য্য হে।

ভবনাথ—শুনেছি ভাই সব কথা। তোমার বাবার যে এত ঋণ ছিল তা বোধ হয় তোমরাও জানতে না। তা উপার্জ্জনের কিছু চেষ্টা কোরছ?

নরেন্দ্র—করছি বৈকি। দিনের পর দিন কলের জল খেয়ে এ আপিস ও আপিস কোরে বেড়াচ্ছি; সর্ব্বত্রই No Vacancy। যাক্ এসব কথা। দেখো না ভাই, যদি কোন চাকরি বাকরী জুটিয়ে দিতে পারো।

ভবনাথ—ভাল কথা, সেদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম। ঠাকুর তোমাকে দেখবার জন্যে খুব ব্যাকুল দেখলাম।

নরেন্দ্র—(ব্যঙ্গভরে) ঠাকুর! হুঁঃ! পরমহংস মশায়ের দুটো মিষ্টি কথায় কি পেটের জ্বালা কমবে বলতে পারো? যার মা বোনদের উপোস করে দিন কাটাতে হয়, যাকে আত্মীয়দের সঙ্গে মামলায় সর্ব্বস্বান্ত হতে হয়, ঐ সব ধর্ম্মের বুলিতে তার পেট ভরে না ভাই।

ভবনাথ—ভগবানে বিশ্বাস রাখো নরেন। বিপদের মধ্যে দিয়েই তিনি মানুষকে পরীক্ষা করেন।

নরেন্দ্র—(শ্লেষের সুরে) হ্যাঁ; আগুনে পুড়িয়ে খাঁটী সোনা করে নেন। দেখো, এসব ভাল ভাল কথা টানা-পাখার নীচে হাওয়া খেতে খেতে বলা সহজ। যাদের ভাত কাপড়ের ভাবনা নেই তারা এ সব নিয়ে সখ করতে পারে। আমিও এর আগে এ রকম করেছি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে ভুল করেছি, মহা ভুল করেছি। সংসারে বাঁচতে গেলে চাই টাকা; ধর্ম্মের বুলি আউড়ে এখানে বাঁচা চলে না।

ভবনাথ—নরেন, তুমি যা বোলছ, হয়ত সত্যি। তবু ভগবানে বিশ্বাস রাখো, নইলে বাঁচবে কি নিয়ে? সুখ দুঃখ সবই তাঁর ইচ্ছা—

—গান—

সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।

নরেন্দ্র—থাম্, থাম্ (অভিমান ভরে বলিতে লাগিল) ইচ্ছাময়ী! কৃপাময়ী! কৃপাময়ের সৃষ্টিতে এত দুঃখ দারিদ্র্য কেন? শিবের সংসারে এত অশিব কেন? ভগবান যদি দয়াময় মঙ্গলময়, তবে লাখ লাখ লোক দুটি অন্ন না পেয়ে দুর্ভিক্ষে মরে কেন? জগতে যা কিছু ঘটছে তা দৈবাৎ অথবা কোন শয়তানের চক্রে। ঈশ্বর বলে জগৎনিয়ন্তা কেউ নেই, আর যদি কেউ থাকে সে মঙ্গলময় বা করুণাময় নয়।

ভবনাথ—নরেন, তুমি কি বোলছ? ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়ে তুমি যে নাস্তিক হোয়ে পড়েছ। আমার কথা শোন, একদিন দক্ষিণেশ্বর যাও, শান্তি পাবে।

নরেন্দ্র—আচ্ছা, তুমি কোথায় যাচ্ছিলে যাও। আমার শান্তির জন্যে আর মাথা ঘামিও না। পেটে যেখানে আগুন জ্বলে, মুখের দুটো মিষ্টি কথায় সেখানে কি শান্তি আসে হে? তার চেয়ে

বোধ হয় মদ খাওয়া ভাল, বাইজী বাড়ী যাওয়া ভাল, শুনেছি তাতে নাকি লোকে শান্তি পায়।

ভবনাথ—ছিঃ ছিঃ, নরেন! তুমি অসৎ সঙ্গে পড়েছ। তাই আর দক্ষিণেশ্বর ভাল লাগে না। আশ্চর্য্য! একথা উচ্চারণ করতে তোমার আজ লজ্জা হোল না?

নরেন্দ্র—লজ্জা! কিসের লজ্জা? যা ন্যায় বলে মনে করি, মুখে তা বলতে আমার কোন দিনই বাধে না। এক দল মানুষ শান্তি খুঁজছে ত্যাগে, ভগবানকে ডেকে, তিনি মঙ্গলময় পরম-কারুণিক এই বিশ্বাস রেখে। আর একদল লোক শান্তি খুঁজছে ভোগে—কামিনী-কাঞ্চন তাদের কাম্য—মদ আর মেয়ে-মানুষ তাদের চরম লক্ষ্য। আমিও শান্তি চাই, তাই পথ খুঁজছি।

ভবনাথ—তুমি যে পথের কথা বলছো তাতে অনন্তকাল খুঁজলেও শান্তি পাবে না; পাপের পাঁকে আরও ডুববে, আরও কষ্ট পাবে। আমি চল্লাম, ছিঃ তোমার সঙ্গে কথা কইতেও আর ইচ্ছা করছে না।

(প্রস্থান)

নরেন্দ্র—রাগ কোরলে? করো। হয়ত বড্ড আঘাত পেয়েছ। কিন্তু সত্যিই ত দুটো পথই ত যাচাই করা দরকার।

(অপর এক ধনী বন্ধুর প্রবেশ)

ধনী বন্ধু—আরে Hallo! নরেন্দ্র! How funny! তুমি এই সন্ধ্যায়, এমনি উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের মত এই গড়ের মাঠে ঘুরছ কেন?

নরেন্দ্র—এমনিই একটু বেড়াচ্ছি।

ধনী বন্ধু—অনেকদিন দেখিনি তোমায়। এখন তো 'ল' পোড়ছ?

নরেন্দ্র—হ্যাঁ, তুমি কি পোড়ছ এখন?

ধনী বন্ধু—আমার আর পোষাল না brother, সারা জীবনটাই কি ছাত্র থাকবো হে? ওসব ছেড়ে ছুড়ে এখন একেবারে Gentleman at large, আর বাবা Guardianএর তোয়াক্কা রাখি না।

নরেন্দ্র—তা চলেছ কোথায়?

ধনী বন্ধু—বোঝই ত, সন্ধ্যার ফুরফুরে হাওয়ায় কি অমনি বাড়ী বসে থাকা যায়! তাই চলেছি শীলেদের বাগান-বাড়ীতে। আজ সেখানে সারারাত্রি ধরে ফুর্ত্তি চলবে। সহবের সেরা বাইজীদের বায়না করা হয়েছে। Wine and women in plenty. তুমিও চল না।

নরেন্দ্র—আমি?

ধনী বন্ধু—হ্যাঁ হে। অমন চমকে উঠলে কেন? শীল ত তোমার অচেনা নয়। এক সঙ্গেই ত বি. এ পরীক্ষা দিলে। কতদিন সে তোমার খোসামুদী করেছে বাগান বাড়ীতে গিয়ে গান শুনতে আর শোনাতে। তা তুমি ত তার কথা কানেই তোল না। চল না আজ।

নরেন্দ্র—বাগান বাড়ীতে ! আমি ?

ধনী বন্ধু—হ্যাঁ হে, বাগান বাড়ীতে ত তোমার আমার বয়সের ছেলে ছোকরারাই যায়। পঞ্চাশের ওপর যারা তাদের ত বনে যাবার ব্যবস্থা। তুমি কি হে ? এমন একটা বনেদী বাড়ীর ছেলে, বনেদী চালচলন ছেড়ে যেন vagabond হয়ে গেছ। চল চল, ওঠ দেখি। এই ফিটন রোখো রোখো। চল, চল।

(এক রকম জোর করিয়া নরেন্দ্রকে লইয়া গেল।)

চতুর্থ দৃশ্য

বাগানবাড়ীর সুসজ্জিত উদ্যান, ফুল ফুটিয়াছে; অদূরে গীতবাদ্যের আওয়াজ শোনা যাইতেছে; বেড়াইতে বেড়াইতে বাইজী ও নরেন্দ্রনাথের প্রবেশ।

বাইজী—আসুন নরেনবাবু, এই চৌতারাটায় বসা যাক। চমৎকার চাঁদনী রাত, চারিদিকে এই ফুলের মেলা; এ সময় কি ঘরের ভেতর ভাল লাগে? সত্যি বলছি ওদের ঐ হৈ হুল্লোড় আমার একটুও ভাল লাগে না।

(চৌতারায় উপবেশন)

নরেন্দ্র—সত্যি চমৎকার! আমি আশ্চর্য্য হই—বাইরের এই সৌন্দর্য্য ছেড়ে কি কোরে ওরা ঘরের মধ্যে আড্ডা দিচ্ছে।

(চৌতারায় উপবেশন)

বাইজী—ওদের মধ্যে একটুও রোম্যান্স নেই। ওরা ফুলের গন্ধ ভালবাসে না; তার সৌন্দর্য্যকে উপভোগ করবার মত মন ওদের নেই; ওরা চায় সুন্দর সব কিছুকে দু'হাতে দলে পিষে চটকাতে। আপনার সঙ্গে অল্প আলাপেই আমি বুঝে নিয়েছি, আপনি অন্য ধরণের মানুষ—আপনি কবি, আপনার মধ্যে

রোম্যান্স আছে; তাইত আপনাকে নিয়ে লুকিয়ে এখানে পালিয়ে এলুম।

(পাশের একটা গাছ হইতে একটি ফুল তুলিয়া নরেন্দ্রের হাতে দিবার ছলে তাহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতে গেল। নরেন্দ্র একটু সরিয়া বসিল।)

দেখুন ত কি সুন্দর গন্ধ! ফুলটী নিজেকে মেলে ধরেছে তার সমস্ত রূপ রস গন্ধ নিয়ে, কিন্তু তা ভোগ করবার মত রসিক মন কারু নেই এখানে।

নরেন্দ্র—(অন্যমনস্কভাবে) হুঁঃ।

বাইজী—গান শুনবে একখানা? (ফুলটী নরেন্দ্রকে দিল)

নরেন্দ্র—(হাত বাড়াইয়া ফুলটী লইয়া অন্যমনস্ক ভাবে বলিল) না, থাক। আচ্ছা ওরা যে অত মদ খাচ্ছে, ওতে কি সত্যিই আনন্দ পাচ্ছে?

বাইজী—সুর, সুরা আর সুন্দরী নারী, এর চেয়ে আনন্দ আর কিসে আছে বল? আচ্ছা এই চাঁদনী রাতে, এমনি ফুলের মেলায় তোমার কি ইচ্ছে করে না একটু আনন্দ কোরতে?

নরেন্দ্র—আনন্দ? হ্যাঁ, আনন্দের জন্যেই ত এখানে এসেছি। সংসারে বড় অশান্তি, তাই শান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছি।

বাইজী—ও! তাই বলো। তাইত বলি, এমন রূপ, এমন জোয়ান বয়স! তবু মনটা অমন উড়ু উড়ু কেন? তোমার সব অশান্তি

ভুলিয়ে দোব আমি। সত্যি বলছি আজ তোমাকে দেখে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। তুমি যেন চুম্বক পাথর। কত লোকই ত দেখলাম কিন্তু তোমার মত এমনটি আর দেখিনি। দাও না একটা—(চুম্বনোদ্যত)।

নরেন্দ্র—(চমকিয়া সরিয়া গিয়া) ছিঃ, ওকি অসভ্যতা !

বাইজী—(স্বগতঃ) এ দেখছি একেবারে আনাড়ী ! বাজী আমাকে জিততেই হবে ! একটা সামান্য ছোঁড়ার মন ভোলাতে পারবো না ? (প্রকাশ্যে, যেন অভিমানাহতা হইয়া) বেশ আমি চোল্লাম ! কিন্তু তোমার প্রেমে পাগল একজন যুবতীকে এমনি করে নিরাশ করা ভাল হল না ভাই। অ মি চেয়েছিলাম তোমায় আনন্দ দিতে কিন্তু তুমি তা ফিরিয়ে দিলে নিজের হাতে।

নরেন্দ্র—আনন্দ ! আনন্দ তুমি পারো দিতে ? তুমি কি নিজের জীবনে পেয়েছো আনন্দ, যে পরকে তার ভাগ দেবে ? তোমার এই যৌবন —যা দিয়ে তুমি আনন্দ বিলোতে চাও—তা কতদিন থাকবে ?

বাইজী—যতদিন আছে, ততদিনই ভোগ করো। এ আর নূতন কথা কি ? ফুল যতদিন তাজা থাকে ততদিনই তার আদর। শুকিয়ে গেলে সবাই তাকে ফেলে দেয়। কিন্তু কবে শুকোবে বলে তাজা ফুলকে কেউ ফেলে দেয় না।

(জনৈক মত্ত কাপ্তেন বন্ধুর প্রবেশ। সে রীতিমত মত্ত, জড়াইয়া জড়াইয়া গাহিতেছে।)

—গীত—

শ্যামের নাগাল পেলাম না লো সই
আমি কেমনে আর ঘরে রই।
শ্যাম যদি মোর হত মাথার চুল
যতন করে বাঁধতুম বেণী সই
দিয়ে বকুল ফুল।
(ওগো, ও আমার প্রাণের গোলাপ ফুল)
তোমার নাগাল পেলাম না লো সই।

মত্ত বন্ধু—ও গোলাপ, তুমি শুকিও না মাইরী। তোমায় আমি বাটন-হোলে রাখবো—না মালা কোরে রাখবো। দূর···মাইরী, তখন থেকে তোমায় দেখতে না পেয়ে মনটা খালি কেঁদে কেঁদে উঠছে। আমায় অনাথ কোরো না ভাই। (ক্রন্দন)

বাইজী—কেন গা, আবার আমায় খোসামুদী কেন? আজ ত তোমাদের আঙ্গুব এসেছে, তার গলা ত আমার চেয়ে মিষ্টি।

মত্ত বন্ধু—আঙ্গুরের রসের সঙ্গে টাটকা গোলাপের খোসবই—কেয়াবাৎ! দূর—কি হোচ্ছে এখানে—তখন থেকে এটাকে নিয়ে কি ফুসফাস হচ্ছে? ওঃ তুমি শালা বুঝি এই তাজা গোলাপটিকে ফোসলাবার চেষ্টায় আছ। খবরদার মেরে ফেলবো—
(আস্তিন গুটাইতে লাগিল)

বাইজী—আঃ মদন কি হচ্ছে ? যাও, এখান থেকে যাও।

মত্ত বন্ধু—গোলাপ, আমার গোলাপ—তুমি যেতে বোলছ ? কিন্তু কোথা যাবো ? তোমাকে হারিয়ে আমরা যে অনাথ (নরেন্দ্রের হাত ধরিয়া) দেখিস ভাই নিয়ে পালাসনি। মরে যাবো—ওকে না পেলে মরে যাবো—ওহো সব সয়েছি আর পারবো না। (নরেন্দ্রকে) জানো আমার সব ছিল—বাড়ী, গাড়ী, সুন্দরী বউ, ফুটফুটে ছেলেমেয়ে—বউটা গেল মরে—মদের মাত্রাটা দিলাম বাড়িয়ে, শ্রীমতী গোলাপের পায়ে সর্ব্বস্ব দিলাম বিলিয়ে—আমার সোনার চাঁদ ছেলেমেয়েগুলো কোথায় গেল—লোকে বলে না খেয়ে মরেছে—ওঃ, মাইরী ওকে তুই কেড়ে নিসনি ভাই।

বাইজী—মদন কি মাতলামো হচ্ছে ! যাও এখান থেকে যাও।

মত্তবন্ধু—বোকছ, গোলাপ তুমিও বকছো—ওহো হো আমার আজ কেউ নেই, কিছু নেই—

(কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান)

নরেন্দ্র—(বাইজীর প্রতি) তোমার গা ভরা গয়না, দামী কাপড় জামা, কত ধনীর তুমি মনোহারিণী। অর্থ, প্রতিপত্তি কিছুরই অভাব নেই তোমার, তবু তুমি তৃপ্ত নও। এ ছাই ভস্ম শরীরটার জন্য এতদিন অনেক কিছু ত করেছ, কিন্তু শান্তি কি পেয়েছ ? মৃত্যু ত নিশ্চিত, তখনকার সম্বল কিছু করেছ কি ?

বাইজী—ওগো আমার ইহকাল পরকালের সম্বল তুমি। আমি আজ থেকে তোমারই।

(বাইজী নরেন্দ্রকে চুম্বনোদ্যত হইলে নরেন্দ্র বিদ্যুৎপৃষ্টের মত চমকাইয়া ঝাঁকি দিয়া তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া "আঃ, ছিঃ ছিঃ" বলিয়া ঘৃণাভরে তাহার দিকে তাকাইয়া চলিয়া গেল।)

বাইজী—(নিজেকে সামলাইয়া নরেন্দ্রের গতিপথের দিকে তাকাইয়া) আশ্চর্য্য! দেবতা না পাষাণ!

(ধনী বন্ধুর প্রবেশ)

ধনী বন্ধু—হুয়ো, হুয়ো গোলাপ! বাজী হেরে গেলে—ছিঃ ছিঃ।

বাইজী—হেরেছি কি জিতেছি জানি না; কিন্তু দোহাই তোমাদের, এরকম দেবতাকে তোমরা এ নরকে এনো না—এদের আঁচে নরকও ঝলসে যায়।

পঞ্চম দৃশ্য

দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরের সামনের চত্বর। ভবনাথ ও ঠাকুর বসিয়া। সামনে মায়ের মন্দিরের দরজা দেখা যাইতেছে, ভিতরে মাতা ভবতারিণী দেবীর মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে।

ঠাকুর—হ্যাঁরে! নরেন্দর যে অনেক দিন আসে নি, তার খবর কি? তাকে না দেখে যে বড্ড মন কেমন করছে। বাপ মারা যেতে বেচারা বড় কষ্টে পড়েছে।

ভবনাথ—আর মশাই তার কথা বলবেন না। সে একেবারে উচ্ছন্ন গেছে। সে স্পষ্ট বলে মদ খেয়ে যদি শান্তি পাওয়া যায় তবে তাই ভালো। সে যে এমন হবে এ স্বপ্নেও ভাবিনি। একেবারে নাস্তিক।

ঠাকুর—চুপ কর শালা। আর কখনও ঐসব কথা যদি বলিস তোদের মুখ দেখব না। নিন্দে ত সব করতে পারিস; ওদের বাড়ীতে যে এত কষ্ট তার জন্যে তার বন্ধুরা ত কেউ সাহায্য করে না।

ভবনাথ—আজ্ঞে আমাদের ক্ষমতা আর কতটুকু! ওর মা সে দিন বলছিলেন ব্যারিষ্টার আর, মিত্রের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা। বিশ্বনাথবাবু থাকতেই কথাবার্ত্তা হোয়েছিল। তাঁরা খুব বড় লোক, অনেক টাকা যৌতুক দিতে চান; তা'ছাড়া একজন বড় মুরুব্বি ত হবে, কিন্তু নরেনের এক গোঁ বিয়ে কোরব না।

ঠাকুর—(সানন্দে) তাই নাকি? তুই শালা তাকে কি বুঝবি?

অমন শুদ্ধ আধার। কত উঁচু ঘর ওর—ও হোলো রাঙ্গা চোখো
বড় রুই ; আর সব পোনা, কাঠি বাটা এই সব।

(সহসা দূরে নরেন্দ্রকে দেখিয়া)

ঐ যে ন—ন—ন······।

(নরেন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইল। সে হাঁপাইতেছে, দৌড়াইয়া আসিয়াছে, পরনে জুতা নাই, পা ক্ষত বিক্ষত, রক্ত পড়িতেছে, উস্কখুস্ক চুল। ঠাকুর সস্নেহে তাহাকে ধরিয়া স্নেহ-সজল নয়নে গাহিতে লাগিলেন।

—গান—

কথা কহিতে ডরাই
না কহিতেও ডরাই
(আমার) মনে সন্দ হয়
বুঝি তোমায় হারাই, হা—রাই।
আমরা জানি যে মন তোর
দিলাম তোরে সেই মন্তোর
এখন মন তোর, যে মন্ত্রে বিপদেতে তরি তরাই।

(নরেন্দ্রের চক্ষু দিয়া জল গড়াইতে লাগিল)

ভবনাথ—এটা কি হোল ?

ঠাকুর—আমাদের ও একটা হোয়ে গেল। তুই যা না এখান থেকে।
ধ্যান ধারণা করবি, না এখানে বসে থাকবি ?

(ভবনাথ উঠিয়া গেল, নরেন্দ্র শুধু রহিল)

আমি জানি তুমি মার কাজের জন্য এসেছ; সংসারে কখনই থাকতে পারবে না। কিন্তু আমি যতদিন আছি ততদিন আমার জন্যে থাক।

নরেন্দ্র—(সাশ্চর্য্যে) আপনি কি করে জানলেন, আমি কি ভাবছি?

ঠাকুর—মা যে দেখিয়ে দিলেন তোর সংসারে বৈরাগ্য এসেছে। ঠাকুর্দ্দার মত সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ত্যাগ করবি ঠিক করেছিস।

নরেন্দ্র—আমার সম্বন্ধে মা আর কি দেখালেন? আমি মদ খাই, দুশ্চরিত্র, নাস্তিক, আরও কত কি—শোনেন নি?

ঠাকুর—ওবে আমি জানি তোর মত স্বত্ত্বঃগুণী কখনও নীচ কাজ করতে পারে না।

নরেন্দ্র—না, আপনার ধারণা ঠিক নয়। আমি সত্যই গিয়েছিলাম এক বড়লোক বন্ধুর বাগানবাড়ীতে। সেখানে সব মদ খাচ্ছিল, বাইজীর নাচও হচ্ছিল। খুব হৈ হল্লা।

ঠাকুর—তা সেখানে কেন গেলি?

নরেন্দ্র—শান্তি পাওয়া যায় কিনা দেখতে—

ঠাকুর—পেলি?

নরেন্দ্র—ছাইএর শান্তি। যারা নিজেরা শান্তি পায়নি তারা অন্যকে কি করে শান্তি দেবে!

ঠাকুর—জয় কালী! ওরে তুই যে নিত্য সিদ্ধ, নিত্য শুদ্ধ। কোন অন্যায় তোর দ্বারা হবে না। তুই এসেছিস মা'র কাজের জন্যে।

নরেন্দ্র—আর মশাই মার কাজ! যে নিজের মার দু'বেলা দুমুঠো ভাতের জোগাড় করতে পারে না, তার দ্বারা আপনার মার কি কাজ হবে? বাবা থাকতে সবাই ছিল রাজার হালে। আর আমি তাঁর এমনি অধম সন্তান যে মা ভাইদের ভিখিরীর হাল দেখেও কিছু কবতে পারছি না। আচ্ছা মশাই, আপনি ত বলেন আপনার মা আপনার সব কথা শোনেন; তাঁকে বলে আমার সংসারের অভাব মেটাতে পারেন না?

ঠাকুর—মা ইচ্ছা করলে সবই পারেন; কিন্তু আমি যে সে সব কথা বলতে পারিনা রে। তুই জানা কেন?

নরেন্দ্র—আমি?

ঠাকুর—হ্যাঁরে, মাকে মানিসনা, সেই জন্যেই ত তোব এত কষ্ট।

নরেন্দ্র—আমি ত মাকে জানিনা—আর তাঁকে আপনার মত দেখিও নি। আপনি আমার জন্যে মাকে বলুন। অনেক রকমে চেষ্টা কোবলাম, কিছুতেই কিছু হোল না—এখন আপনার মা যদি কিছু করেন তবেই। বলুন না তাঁকে। বলতেই হবে, আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়ব না।

ঠাকুর—ওবে আমি যে কত বার বলেছি, মা, নরেন্দর দুঃখ কষ্ট দূর কর। তুই মাকে মানিস না, সেই জন্যেই ত মা শোনেন না। আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার—আমি বলছি কালীঘরে গিয়ে মা ভবতারিণীকে প্রণাম করে তুই যা চাইবি মা তোকে তাই দেবেন।

নরেন্দ্র—(সবিস্ময়ে) যা চাইব তাই দেবেন ?

ঠাকুর—ওরে মা আমার চিন্ময়ী, ব্রহ্মশক্তি—ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করেছেন ; তিনি ইচ্ছা করলে কী না করতে পারেন। যা না— যা না—

নরেন্দ্র—যাব ? যা চাইব তাই দেবেন ?

ঠাকুর—হ্যাঁরে ; গিয়ে মাকে মানবি আর ভক্তি করে প্রণাম করবি ; তার পর যা চাইবি তাই পাবি ; আমি বলছি।

(নরেন্দ্র ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইল)

মা, মাগো—নরেন্দ্রকে ত্যাগ, তিতিক্ষা ভক্তি দে মা। সংসারের মায়ায় যেন ও না জড়ায়—ওর যে অনেক কাজ।

(নরেন্দ্র মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলে ঠাকুর গান করিলেন)

গান

ডুব ডুব রূপ সাগরে আমার মন
তলাতল পাতাল খুঁজলে, পাবি রে প্রেম রত্ন ধন।
খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ, খুঁজলে পাবি, হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন
দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতি জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ।
ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন জন।
কুবীর বলে শোন শোন ভাব গুরুর শ্রীচরণ ॥

(নরেন্দ্রের প্রবেশ। সে যেন সম্মোহিত)

ঠাকুর—(আগ্রহে) কিরে মার কাছে সংসারের অভাব দূর করবার প্রার্থনা জানালি ?

নরেন্দ্র—(চমকিত হইয়া) এঁ্যা, না মশায় ভুলে গেছি। তাইত, এখন কি করি ?

ঠাকুর—ভুলে গেলি কিরে ! এই আমায় অত করে বললি, আর মার কাছে গিয়ে ভুলে গেলি ? কি দেখলি সেখানে যে ভুলে গেলি ?

নরেন্দ্র—কি দেখলাম ! বুঝিয়ে বলতে পারব না। মন্দিরে যেতে যেতে কেমন একটা নেশায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম, পা টলতে লাগল, মনে একটা স্থির বিশ্বাস এল মাকে সত্য সত্য দেখতে পাব, তাঁর কথা শুনতে পাব। মন্দিরে গিয়ে দেখলাম পাষাণ প্রতিমা সত্যই চিন্ময়ী, সত্য সত্যই জীবিতা—তিনি অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ-স্বরূপিণী। সেই মূর্ত্তি দেখে সব ভুলে গেলাম। বার বার প্রণাম ক'রে বল্লাম "মা বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও। যাতে তোমার অবাধ-দর্শন নিত্য লাভ করি এমনি করে দাও মা"।

ঠাকুর—(সানন্দে) তাই ত রে। মায়ের দেখা পেলি অথচ সংসারের দুঃখ কষ্টের কথা বললি না ?

নরেন্দ্র—তাইত কি হবে এখন ?

ঠাকুর—যা যা ফের যা ; গিয়ে সংসারের কষ্টের কথা জানিয়ে আয়। যা না শালা।

নরেন্দ্র—(মন্দিরের দরজার দিকে যাইতে যাইতে বলিতে লাগিল) মা, আমার সংসারে বড় কষ্ট। যাতে ভাইবোনদের কোন কষ্ট না থাকে,······যাতে তোমার দিকে মন দিতে পারি······

(বলিতে বলিতে দরজার সামনে গিয়া করজোড়ে দাঁড়াইল)

ঠাকুর—(স্বগতঃ) মা, মাগো, দেখিস মা ; সংসারের মায়ায় ওকে জড়িয়ে দিসনি মা।

নরেন্দ্র—(মায়ের মূর্তির দিকে চাহিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত বলিতে লাগিল) মা, মা, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও, জ্ঞান দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও।

(নতজানু হইয়া প্রণাম করিল)

ঠাকুর—(সানন্দে হাততালি দিয়া স্বগতঃ) জয় কালী, জয় কালী। নে টাকা, নে ভাত কাপড়।

(নরেন্দ্র অভিভূতের মত ফিরিয়া আসিল)

ঠাকুর—কিরে এবার বলেছিস ত ?

নরেন্দ্র—এ্যাঁ ! ওহো, না মশায় এবারও ত বলা হয় নাই।

ঠাকুর—সে কিরে, এবারও বলিস নি ?

নরেন্দ্র—না মশায়, মাকে দেখবামাত্র কি এক দৈবী শক্তিতে সব কথা ভুলে কেবল জ্ঞান ভক্তি লাভের কথাই বলেছি। কি হবে এখন ?

ঠাকুর—দূর ছোঁড়া, নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ওরকম দরকারী প্রার্থনাটা ক'রতে পারলি না? যা যা আর একবার গিয়ে ঐ কথাগুলো শীগ্রী জানিয়ে আয়; যা শীগ্রী যা।

নরেন্দ্র—আবার যাবো?

ঠাকুর—তা তোর মায়ের দুঃখ, ভাইবোনদের দুঃখ যখন সইতে পারছিস না, তার জন্যে শান্তি পাচ্ছিস না, তখন মাকে সে কথা বলবি না? যা না ছোঁড়া, আর একবার গিয়ে বল না—বার বার তিন বার।

(নরেন্দ্র নিজেকে সংযত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া বারবার উচ্চারণ করিতে করিতে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইল।)

নরেন্দ্র—মায়ের বড় কষ্ট, ভাই বোনদের বড় কষ্ট। টাকা চাই, টাকা চাই। বাঁচবার জন্য চাই টাকা, ভাত চাই, কাপড় চাই—

(বাহিরে ঠাকুর মাকে করজোড়ে কি যেন বলিতেছেন।)

নরেন্দ্র—

(মন্দিরের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে প্রতিমার দিকে তাকাইয়া করজোড়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত বলিতে লাগিল)

চাই, চাই, তোমায় চাই মা। ইচ্ছাময়ী, করুণাময়ী, জগৎপ্রসবিনী

হে মহাকালী, মহাশক্তি, শক্তি দাও, বল দাও, জ্ঞান দাও, শান্তি দাও, আনন্দ দাও মা—।

(সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।
ঠাকুর আনন্দে হাততালি দিতে দিতে তাহার কাছে আসিয়া তাহাকে তুলিয়া ধরিলেন।)

ঠাকুর—কিরে এবার বলেছিস ত ? এবার ত ভুলিস নি ?

নরেন্দ্র—না মশায় বলতে পারলুম না, এবার মনে ছিল, কিন্তু চাইতে পারলুম না।

ঠাকুর—সে কিরে ? তবে আমাকে অমন করে বল্লি কেন ?

নরেন্দ্র—ভুল করেছি ; ঠাকুর ভুল করেছি। রাজার প্রসন্নতা লাভ করে তাঁর কাছে কি লাউ কুমড়ো ভিক্ষা কোরব ? আমার মন আজ ভরে উঠেছে ; এ কী মূর্ত্তি—একি দেখলাম আজ ! ঐ পাষাণ প্রতিমা যে সত্য চৈতন্য রূপিনী, বরাভয় দাত্রী জগজ্জননী। (নিজেকে সংযত করিয়া) কিন্তু মশায় এখন আমার মনে হচ্ছে, এ আপনারই খেলা। আপনার ইচ্ছাশক্তি অসীম ; আপনি আমায় সব ভুলিয়ে দিয়েছেন। না—না আমি পারব না। আমার দ্বারা হবে না। আপনাকেই মাকে বলতে হবে—আমার মা ভাই বোনদের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব যেন না থাকে।

ঠাকুর—ওরে আমি যে মার কাছে ঐ সব চাইতে পারি না—আমার মুখ দিয়ে ভাত কাপড়ের কথা বেরোয় না। তোকে বললুম

যা চাইবি তাই পাবি, তা তুই চাইতে পারলি না ; তোর অদৃষ্টে সংসার সুখ নেই, তা আমি কি কোরব ?

নরেন্দ্র—না মশায়, তা হবে না। আপনাকে আমার জন্য ঐ কথা বলতেই হবে। আমার খুব বিশ্বাস আপনি ব'ল্লেই তাদের আর কোন কষ্ট থাকবে না। তাদের অভাব না ঘুচলে আমি যে কিছুতেই মন স্থির করতে পারি না।

(সস্নেহে নরেন্দ্রের মাথায় পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে, ভাবে মায়ের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন।)

ঠাকুর—দে না মা নরেনকে অনেক টাকা। দিবি নে ? ওরে তোর টাকা হলো না। মা বলছেন—মোটা ভাত, মোটা কাপড় হতে পারে। ভাত ডাল হতে পারে ; কিন্তু অনেক টাকা তোর হবে না।

নরেন্দ্র—মোটা ভাত মোটা কাপড়। তা হোলেই হোল। (ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া) আমায় মার গান একটা শিখিয়ে দেবেন ?

ঠাকুর—দোব না ! আমার যে আজ কি আনন্দ হচ্ছে। তুই আজ মাকে মেনেছিস। আয় আয় আমার ঘরে আয়।

(নরেন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিয়া প্রস্থান)

যবনিকা

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(ঠাকুরের ঘব। রামকৃষ্ণদেব ছোট খাটটিতে বসিযা আছেন। যোগীন্দ্র কাঠেব তোবঙ্গ ঝাড়িতেছে। রাম নীচে বসিযা আছে।)

যোগীন্দ্র—এ হে হে ; আপনার কাপড়ের বাক্সয় আরশুলা ঢুকেছে। সব কেটে নষ্ট করে দেবে।

ঠাকুর—যা যা, আরশুলাটা ধরে বাইরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেল, নইলে আবার এসে উৎপাত করবে। (যোগীন্দ্র আরশুলা ধরিয়া বাহিরে গেল) তারপর রাম, তোমার বাড়ীর খবর কি ? সৎমা, বাবা কেমন আছেন ?

রাম—আর মশায়, বাবা একেবারে গোল্লায় গেছেন।

ঠাকুর—শোন কথা, বাবা গোল্লায় গেছেন, আর উনি ভাল আছেন।

রাম—তা মশায় বাবা মা যদি কোন গুরুতর অপরাধ করে বা ভয়ানক পাপ করে থাকেন তবুও তা'দিকে মানতে হবে ?

ঠাকুর—হবে না! মা দ্বিচারিণী হলেও ত্যাগ করবে না। 'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ী যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।' মা বাপ কি কম জিনিষ গা! তারা প্রসন্ন না হলে ধর্ম্ম টর্ম্ম

কিছুই হয় না। বাপ মা মানুষ কর্ল্লে। এখন নিজের কত ছেলে পুলে হোল, আর মাগ নিয়ে বেরিয়ে এসে আলাদা হওয়া! বাপ মাকে ফাঁকি দিয়ে, ছেলে মাগ নিয়ে বাউল বষ্টুমী সেজে বেরন—ছিঃ ছিঃ। (রাম চুপ) কতকগুলি ঋণ আছে। দেব ঋণ, ঋষি ঋণ, আবার মাতৃ ঋণ, পিতৃ ঋণ, স্ত্রী ঋণ। মা বাপের ঋণ শোধ না করলে কোন কাজই হয় না। স্বয়ং চৈতন্যদেবকেও মাতৃ আজ্ঞা নিয়ে তবে সন্ন্যাস নিতে হয়েছিল।

রাম—স্ত্রী ঋণ কি রকম ?

ঠাকুর—আছে বৈকি। স্ত্রী কোবলে তার কাছেও ঋণ আছে। হরিশ স্ত্রীকে ত্যাগ করে এখানে রয়েছে। যদি তার স্ত্রীর খাবার যোগাড় না থাকতো,—তাহলে বলতুম ঢ্যামনা শালা। জ্ঞানের পর ঐ স্ত্রীকে দেখবে সাক্ষাৎ ভগবতী। চণ্ডীতে আছে, “যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা” ; তিনিই মা হয়েছেন।

রাম—আচ্ছা পবিবাবের প্রতি কর্ত্তব্য কত দিন ?

ঠাকুর—সন্তান নিজে সমর্থ হলে আর তাদের ভার নেবার দরকার নাই। পাখীর ছানা খুঁটে খেতে শিখলে, আবার মার কাছে খেতে এলে মা ঠোক্কর মারে। (হাসিয়া) তা বলে তুমি বাপ মাকে ঠোক্কর মের না।

রাম—আমি এখন উঠি, পরে আসব। (প্রণাম করিযা প্রস্থান। যোগীন্দ্রের প্রবেশ)

ঠাকুর—কিরে আরশুলাটা মেরে ফেলেছিস তো ?

যোগীন্দ্র—মারতে মায়া লাগলো। ছেড়ে দিয়েছি।

ঠাকুর—আমি তোকে মেরে ফেলতে বল্লাম, আর তুই কিনা সেটাকে ছেড়ে দিলি। যেমনটী করতে বলব ঠিক তেমনটি করবি, নইলে ভবিষ্যতে গুরুতর বিষয়েও নিজের মতে চলতে ইচ্ছে হবে। তাতে ক্ষতি হবে। বুঝলি ?

যোগীন্দ্র—আজ্ঞে হ্যাঁ, আর এমন কোরব না।

ঠাকুর—ওখানে কে ? নরেন না ?

যোগীন্দ্র—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঠাকুর—তা ওখানে বসে কি করছে ? এখানে আসে না কেন ?

যোগীন্দ্র—কি জানি, আপনাদের ব্যাপার আপনারাই জানেন। মাঝে ত দেখতাম আপনি নরেন নরেন কোরে অস্থির। আবার মাস খানেক ধরেই দেখছি, নরেন এলে আপনি তার সঙ্গে কথা বলেন না। একলা শুয়ে আছেন, যেই নরেন ঘরে ঢুকলো অমনি পেছন ফিরে শুলেন। তাই সেও আর আপনার কাছে আসে না। বাইরে বাইরে ঘুর ঘুর করে, আর দূর থেকে আপনাকে প্রণাম করে সন্ধ্যে বেলা বাড়ী চলে যায়।

ঠাকুর—ডাক, ডাক, ওকে ডাক। ওরে ও নরেন, নরেন, (নরেন্দ্রের প্রবেশ ও প্রণাম) আয় বোস বোস। আচ্ছা তুই এখানে কি

কোরতে আসিস বল দেখি ? আমি ত তোর সঙ্গে একটা কথাও বলি না।

নরেন্দ্র—আমি কি আপনার কথা শুনতে এখানে আসি মশাই আপনাকে ভালবাসি, দেখতে ইচ্ছে করে, তাই এখানে আসি। আপনার গলার অসুখ কি খুব বেড়েছে ?

ঠাকুর—ওরে শোন শোন, আমার নরেনের কথা শোন। আমি তোকে পরীক্ষা করে দেখছিলাম। আদর যত্ন না পেলে তুই পালাস কিনা। তোর মত আধারই এতটা অবজ্ঞা সইতে পারে। অন্য কেউ হলে এত দিন কোন কালে পালাত, এদিকে আর মাড়াত না। ওরে যোগীন, যা যা, নহবতে বলে পাঠা নরেন আজ এখানে খাবে, অনেক দিন ও এখানে কিছু খায়নি।

(যোগীন্দ্রেব প্রস্থান)

হ্যাঁরে, তুই নাকি গিরিশ ঘোষের ওখানে প্রায়ই যাস ?

(ঠাকুর মাঝে মাঝে নিজের গলায় হাত বুলাইতেছেন ও তাঁহার মুখে চোখে ক্ষতের যন্ত্রণার প্রকাশ দেখা যাইতেছে।)

নরেন্দ্র—আজ্ঞে হ্যাঁ, মাঝে মাঝে যাই।

ঠাকুর—দেখ, রশুনের বাটী যতই ধোও না কেন, গন্ধ একটু থাকবেই। অনেক দিন ধরে কামিনী-কাঞ্চন ঘাঁটলে রশুনের গন্ধ হয়। ছোকরারা শুদ্ধ আধার, কামিনী-কাঞ্চন স্পর্শ করে নাই। নতুন

হাঁড়ি, আর দৈ পাতা হাঁড়ি। দৈ পাতা হাঁড়িতে দুধ রাখতে ভয় হয়, প্রায়ই দুধ নষ্ট হয়ে যায়।

নরেন্দ্র—কিন্তু মশায়, ওঁর ত আপনার ওপর অগাধ ভক্তি ; আপনিও ত ওঁর আমমোক্তারী নিয়েছেন।

ঠাকুর—ওরা থাক আলাদা। যোগও আছে ভোগও আছে, যেমন রাবণের ভাব—নাগকন্যা দেবকন্যাও নেবে, আবাব রামকেও লাভ কববে।

নরেন্দ্র—গিরিশ ঘোষ আগেকার সঙ্গ ছেড়েছে।

ঠাকুর—ও যে বুড়ো বয়সে দামড়া হয়েছে। এখনও বড্ড গালাগাল আর মুখ খারাপ করে। তবে ওর খুব বিশ্বাস ; ষোল আনার ওপর আরো চার আনা। হ্যাঁরে, তোকে যে অষ্টাবক্র সংহিতা পড়তে বলেছিলাম, তা কতদূর পড়লি ?

নরেন্দ্র—পড়ছি, কিন্তু ভাল লাগছে না। মশায়, কিছুই মাথায় ঢুকছে না। চবম নাস্তিকতা আব অদ্বৈতবাদে তফাৎটা কোথায় আমি ত বুঝছি না।

ঠাকুর—সে কিরে ?

নরেন্দ্র—নয়ত কি ? সৃষ্ট জীব আপনাকে স্রষ্টা বলে ভাববে! আমি ঈশ্বর, ঘটীটা ঈশ্বর, বাটীটা ঈশ্বর! জন্ম মৃত্যুব অধীন সকল জীবই ঈশ্বব! মুনি ঋষিদের কি মাথা খারাপ হয়েছিল মশায় ?

ঠাকুর—তা তুই এখন না হয় ঐ কথা না নিলি, তা'বলে মুনি ঋষিদের

নিন্দে করছিস কেন? ঈশ্বরের রূপের ইতিই বা কোরছিস কেন? এই বলে তাঁকে ডাক যে হে ঈশ্বর তুমি কেমন জানি না, তুমি যেমন তেমন ভাবেই দেখা দাও।

নরেন্দ্র—ডাকলে দেখা পাবো?

ঠাকুর—ঠিক ঠিক ডাকলে নিশ্চয় দেখা দেবেন, এ আমি শপথ করে বলছি। তখন তিনি যে রূপে প্রকাশিত হবেন, তাই বিশ্বাস করাব।

নরেন্দ্র—আচ্ছা সাধনায় কি শক্তি টক্তি হয়?

ঠাকুর—হয় বৈ কি। তপস্যার ফলে অনিমাদি অনেক বিভূতি আমি পেয়েছি। এই বিভূতির ফলে অনেক আশ্চর্য্য জিনিষ করা যায়—পাওয়াও যায়। তা আমার ত পরনের কাপড়েরই ঠিক থাকে না; আমি আর ও সব নিয়ে কি কোরব। তাই ভাবছি মাকে বলে তোকে ঐ সব বিভূতি দিয়ে দোব। মা যে আমাকে বলেছে তোকে অনেক কাজ কোবতে হবে। ঐ সব শক্তি পেলে তুই কাজে লাগাতে পাববি।

নরেন্দ্র—তা ঐ সব পেলে আমাব ঈশ্বব লাভে কি সহায হবে?

ঠাকুর—না, তা হবে না; তবে ঈশ্বর লাভ ক'রে যখন তাঁর কাজ করবি তখন এর দ্বারা অনেক কাজ পাবি।

নরেন্দ্র—মশায়, তবে এখন ওসবে আমার দরকাব নাই। আগে ঈশ্বর লাভ হোক, তারপর স্থির কোরব ঐ সব বিভূতি টিভূতি নোব

কি না। এখন ঐ সব নিয়ে যদি লোভে পড়ে তার অযথা ব্যবহার করি তবে যে সর্বনাশ হবে, আসল উদ্দেশ্যই যে ভুলে যাব।

ঠাকুর—তবে নিবি না?

নরেন্দ্র—আজ্ঞে না।

ঠাকুর—তবে অন্য কাউকে দিয়ে দোব এসব?

নরেন্দ্র—দিন গে। আমায় শুধু ঈশ্বর লাভের পথ দেখিয়ে দিন। আমি আর পারছি না। এক একটা দিন যাচ্ছে আর মনে হচ্ছে এ জন্মে আর বুঝি ব্রহ্মকে জানা হোল না।

ঠাকুর—তামাক খাবো।

নরেন্দ্র কলিকায় তামাক সাজিতে লাগিল,
ঠাকুর হাততালি দিয়া গান গাহিতে লাগিলেন।

(গান)

আমার মা ত্বং হি তারা।
তুমি ত্রিগুণ ধরা পরাৎ পরা॥
তোরে জানি মা ও দীন দয়াময়ী।
তুমি দুর্গমেতে দুঃখ হরা,
তুমি জলে তুমি স্থলে তুমি আদ্য মূলে গো মা।
আছ সর্ব্ব ঘটে অক্ষপুটে
সাকার, আকার, নিরাকার॥

তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী
তুমিই জগদ্ধাত্রী গো মা।
তুমি অকুলেব ত্রাণকর্ত্রী
সদাশিবেব মনোহবা॥

(কলিকা ধবাইয়া নবেন্দ্র হুকায় চড়াইয়া আগাইয়া দিল)

কল্কেতে খাবো।

(হুকা হইতে কলিকা লইয়া ঠাকুর নিজে ।৩ টান দিয়া নবেনেব দিকে কলিকা ধরিয়া)

খা না—খা না।

নবেন্দ্র—(ইতস্ততঃ করিয়া) আচ্ছা, আমি খাবো'খন।

ঠাকুব—খা না—শালা।

নরেন্দ্র—(হাত বাড়াইয়া) দিন।

ঠাকুব—আমার হাতেই খা।

নবেন্দ্র—সে কি! আপনি ব্রাহ্মণ, আমি কায়স্থ; আপনাব হাতে কি খেতে পারি!

ঠাকুর—তোর ত ভারি হীন বুদ্ধি! তুই আমি কি আলাদা? এটাও আমি ওটাও আমি।

(কলিকাশুদ্ধ হাত পুনরায় নবেন্দ্রের মুখের কাছে ধরিলেন। নবেন্দ্র অগত্যা ঠাকুরের হাতে মুখ দিয়া ২।৩টি টান দিল। ঠাকুর পুনরায় সেই হাতে কলিকা টানিতে আরম্ভ করিলেন।)

নরেন্দ্র—করেন কি? হাতটা ধুয়ে নিন।

ঠাকুর—দূর শালা, তোর ত ভারি ভেদ বুদ্ধি। তুই যে, আমিও সে—তুই-ই মায়ের ছেলে। তুইও ব্রহ্ম এও ব্রহ্ম।

(যোগীন্দ্রের প্রবেশ)

যোগীন্দ্র—লাটু বল্লে মা নরেনের ভাত চাপালেন, একটু দেরী হবে।

ঠাকুর—সে কি! ওর যে অম্বলের ব্যামো ধরেছে; দেরী কোরলে ত হবে না। আমার জন্যে যা রান্না হয়েছে তাই থেকে আগে ওকে ভাত দিতে বল গে।

নরেন্দ্র—কি সর্ব্বনাশ! কি বোলছেন আপনি? আপনার জন্যে তৈরী খাবার খাব আমি!

ঠাকুর—ওরে! তুই কে তা যে তুই জানিস না। তা যেদিন জানবি সে দিন আর তোকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না। আয়—চল গঙ্গার ঘাটে যাই, স্নান করে আসি।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

দক্ষিণেশ্বরে নহবতের ঘব

রাখাল—মা, মাগো—

শ্রীমা—(ভিতব হইতে শ্রীমা উত্তব দিলেন) কে ? রাখাল।

রাখাল—হ্যাঁ মা।

(অবগুণ্ঠনবতী শ্রীমা দবজায় আসিযা দাঁড়াইলেন।)

শ্রীমা—কি বাবা ?

রাখাল—পানিহাটীব মহোৎসব থেকে ফেরার পর থেকেই ঠাকুরের গলাব বেদনা আব সারছে না। ক্রমশঃ বেড়েই যাচ্ছে।

শ্রীমা—তা আমি কি বোলব বাবা। সবই তাঁব ইচ্ছা। শ্যামাদাস কবরেজ মশায় ত জবাব দিয়েছেন এ রোগ সাববে না।

রাখাল—আজ গলা থেকে বক্ত বেরিয়েছে।

শ্রীমা—তোমবা তাঁব এত সন্তান রয়েছ—যা ভাল বোঝ করবে, তা আমাকে কি জিজ্ঞাসা কোবছ বাবা ?

রাখাল—আমাদের কথা যে শোনেন না। গলায় এই অসুখ, কবরেজ কথা বোলতে বারণ করেছেন অথচ অনবরত লোক আসছে আর অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন।

শ্রীমা—লোক শিক্ষার জন্যেই যে ওঁব দেহ ধারণ।

রাখাল—এর ওপর আজকাল ত ঘন ঘন কোলকাতা যাচ্ছেন আর সেখানে ভক্তদের নিয়ে কীর্ত্তনানন্দে মাতামাতি লেগেই আছে। নরেন বলছিল এই টানাটানির চেয়ে ঠাকুরকে কলকাতায় থাকতে ; ভক্তদেরও সুবিধা, চিকিৎসারও ভাল ব্যবস্থা হবে।

শ্রীমা—তোমরা পাঁচজনে যা ভাল বুঝবে তাই করো। তাঁরও মত নাও।

রাখাল—তা মা, আজ অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে কত জনের অন্ন সেদ্ধ হোল ?

শ্রীমা—যার কাজ তিনিই করাচ্ছেন। ওঁর এ সংসারে কি হিসেব করে কাজ করা চলে ? ঠাকুর একদিন বলেছিলেন, "একটা ছেলে কি খুঁজছ গো। তোমার এত ছেলে হবে যে তুমি 'মা' বোলে তিষ্ঠতে পারবে না।" তাই আজ দেখছি বাবা, কত দেশ-দেশান্তর থেকে কত ছেলেই যে আমার আসছে। এ আনন্দের হাটে কি হিসেব কোরে চাল নেওয়া যায় বাবা !

রাখাল—মা, ঐ ছোট্ট ঘরে সারাদিন একলাটী থাকতে তোমার কষ্ট হয় না—তার ওপর এত লোকের রান্না ?

শ্রীমা—এই ত মায়ের কর্ত্তব্য। যাই দেখি, তোমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে নরেনের ভাত বুঝি ধরে গেল।

(দরজা হইতে সরিয়া গেলেন)

রাখাল—আনন্দের হাট ! আনন্দের হাটই বটে। এমন সাক্ষাৎ

দেব দেবী যেখানে, সেখানে নিরানন্দ আসতে যে ভয় পায়। সার্থক রাণী রাসমণির মন্দির, ধন্য এই দক্ষিণেশ্বর!

(লাটুর প্রবেশ)

লাটু—মা, নরেনের খাবারের জন্য ঠাকুর বড় ব্যস্ত হয়েসেন। নরেনের শরীর খারাপ, অম্বলে ভুগছে। তাই তাড়াতাড়ি ভাত দিতে বল্লেন।

(দরজার সামনে থালা হাতে অবগুণ্ঠনবতী শ্রীমা দাঁড়াইলেন।)

শ্রীমা—একটু দেরী আছে। ভাতটা হয়ে এল বলে—

লাটু—ঠাকুর বলেছেন তাঁর ভাত থেকেই নরেনকে আগে দিতে।

(শ্রীমার হাত হইতে থালা পড়িয়া গেল। আতঙ্কে বলিয়া উঠিলেন)

শ্রীমা—কি বোল্লে! তাঁর ভাত থেকে নরেনকে আগে দিতে বল্লেন?

লাটু—আজ্ঞা হাঁ। নরেন আপত্তি করেসিল। তিনি শুনলেন না। নরেনের ওপর রাগ কোরো না মা।

শ্রীমা—রাগ! না এ রাগের সময় নয়। বড় দুঃখের সময়। এ আনন্দের হাট আর বেশী দিন নয়! তোমরা মহা অমঙ্গলের জন্য প্রস্তুত হও।

রাখাল—এ কি! এ তুমি কি বোলছ মা? মা হোয়ে ছেলেদের অভিশাপ দিচ্ছ?

শ্রীমা—অভিশাপ নয় বাবা। এ তাঁরই কথা। তোমাদের, আমার, সকলেরই চরম দুর্দ্দিনের আর দেরী নাই। তোমাদের ঠাকুরকে আর তোমরা ধরে রাখতে পারবে না।

রাখাল—হঠাৎ একি কথা মা? কি এমন ঘটলো যাতে এমন সর্ব্বনাশা কথা তুমি তুলছ?

শ্রীমা—এ আমার কথা নয় বাবা, তাঁরই কথা। তিনি অনেক আগেই বোলেছিলেন "যখন যার তার হাতে খাবো, কলকাতায় রাত কাটাব এবং খাবারের অগ্রভাগ অন্য কাউকে দিয়ে নিজে খাব তখন জানবে আমার দেহ রক্ষার আর দেরী নাই।" তোমরা ত জানো, ওঁর ভোগের অগ্রভাগ উনি কাউকে দেন না; অথচ নিজে আজ আদেশ কোরেছেন নরেনকে তা দিতে। আর এদিকে গলার রোগও দেখা দিয়েছে।

লাটু—(বিহ্বলভাবে) তাহোলে, কি হবে মা! চিকিৎসায় কি কোন ফল হবে না?

শ্রীমা—তোমাদের কর্ত্তব্য তোমরা করো। ফলাফল তাঁর হাতে।

রাখাল—তাইত ভাবি, যিনি ভবযন্ত্রণা থেকে পাপীতাপীকে উদ্ধার কোরছেন, তিনি নিজে গলার রোগে এত কষ্ট পাচ্ছেন কেন?

লাটু—ঠাকুর, ঠাকুর আমায় উপলক্ষ্য কোরে একি খেলা খেললে!

(কাঁদিয়া ফেলিল।)

তৃতীয় দৃশ্য

শ্যামপুকুরের বাড়ীর কক্ষ—

নরেন্দ্র, ভবনাথ, গিরিশ দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছেন।

নরেন্দ্র—মাষ্টার মশায় এখনও ত ফিরলেন না। সকালে গেছেন মহেন্দ্রবাবু ডাক্তারকে আনতে—বেলা দশটা বাজে—

ভবনাথ—আর ভাই শুধু শুধু ডাক্তার দেখিয়ে কি হবে! তিনি ত বলেই দিয়েছেন এ ক্যানসার—সারবার নয়। এ-ও ঠাকুরের লীলা।

নরেন্দ্র—লীলাই যদি তবে এত ভাবছ কেন? চোখ ছল ছল কেন? তিনি যখন মানুষ তখন অসুখও হবে, চিকিৎসাও করাতে হবে; লীলা বলে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে কি চলবে?

গিরিশ—এই অসুখের ভেতর দিয়েই তিনি হয়ত অনেক মঙ্গল করবেন। যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ বাণবিদ্ধ হয়েছিলেন! অবতারদের লীলা বোঝা ভার।

নরেন্দ্র—দেখ গিরিশবাবু, তোমার এই অন্দ ভক্তি দিয়েই আমাদের এক দলের মাথা তুমি খাচ্ছো। তুমি ঠাকুরকে বকলমা দিয়ে যা খুসী কোরছো, আর নেশার ঘোরে তাঁর কাছে এসে মাঝে মাঝে

কাঁদছো। এর ফলে অনেকের ধারণা হয়েছে যে ঐ রকম বকলমা দিয়ে, নিজে কিছু না করলেও চলে ; এ ভারী খারাপ।

ভবনাথ—ঠাকুর বলেন যার যা পথ। তুমি জ্ঞানমার্গের লোক, ভক্তির কিছু বোঝ না ; তাই বলে পরের ভাব নষ্ট কর কেন ?

নরেন্দ্র—আরে রাখো তোমার ঐ প্যানপেনে কাঁছনে ভক্তি। মান মাথুরের পালা শুনে যারা কাঁদে, তারা নিজেদের পবিবারের কথা ভেবে কাঁদে। শুধু শুধু কাঁদা দুর্ব্বল স্নায়ুর লক্ষণ। পুরুষ মানুষ, সর্ব্বদা মেয়ের মত ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ কিরে !

গিরিশ—ওহে, তুমি থাকো তোমার শুকনো জ্ঞান নিয়ে। আমি বেশ আছি বেড়াল ছানা হয়ে ; ও তোমার বাঁদুরে বুদ্ধিতে আমার দরকার নেই।

ভবনাথ—ঠিক বলেছেন। পরমহংসদেব বেশ বলেন, বেড়াল ছানার পাটোয়ারী বুদ্ধি নাই, কেবল মিউ মিউ করে। কোথায় যাবে, কি কোরবে কিছুই জানে না। মা কখনো হেঁসেলে রাখছে, কখনও গেরস্তর বিছানায় রাখছে—মা যা কোরছেন তাই ভাল। এরা মাকে আমমোক্তারী দিয়ে নিশ্চিন্ত। আর বাঁদর ছানা নিজে যো সো করে মাকে আঁকড়ে ধরে। এদের একটু কর্ত্তৃত্ব বোধ আছে। আমায় তীর্থ কোরতে হবে, জপ তপ কোরতে হবে, তবে ঈশ্বরকে পাবো। তোমার এইভাব।

গিরিশ—দেখ সরু আল রাস্তায় যাবার সময় ছেলে যদি বাপের হাত

ধরে যায় তবে হয়ত পড়ে যেতে পারে। কিন্তু বাপ যদি ছেলের হাত ধরে নিয়ে যায় তবে আর পড়বার ভয় থাকে না। কিন্তু তুমি ত ওঁকে অবতার বলে মান না। অবতারকে চেনার ভাগ্য সকলের হয় না, চেনার চেষ্টাও চাই। ঠাকুর যে বলেন দীঘিতে মাছ আছে জানলেই হয় না, ধরতে গেলে চার ফেলতে হয়। সরষের মধ্যে তেল আছে কিন্তু সরষেকে পিষতে হয়। মেতীতে হাত রাঙ্গা হয়, কিন্তু মেতী বাটতে হয়।

নরেন্দ্র—এ ত বেশ কথা ; কিন্তু এর মধ্যে অবতার কোথায় পেলে ? অবতার! ঈশ্বর! হুঁঃ! ঈশ্বরের কি অসুখ হয় ?

গিরিশ—হয়, দেহ ধারণ করলে রোগ শোক, খিদে, তেষ্টা সবই থাকে। মনে হয় আমাদেরই মত। রাম সীতার শোকে কেঁদেছিলেন, "পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে"। ঈশ্বর লীলা করবার জন্যে মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হন, যেমন—রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব। তুমি শোননি, ভৈরবী ব্রাহ্মণীর মত অত বড় জ্ঞানী— আজ নয়, পঁচিশ বছর আগে ঠাকুরকে প্রথম দেখেই অবতার বলে স্বীকার করেন।

নরেন্দ্র—যে যাই বলুক, রোগ শোক মৃত্যুর অধীন মানুষকে অবতার বলতে, ঈশ্বর বলতে পারি না ; অবশ্য সর্বজীবে নারায়ণ সে কথা আলাদা।

গিরিশ—বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। তর্ক করে তুমি বুঝবে

না। ঠাকুর যে বলেন, রাম নামে বিশ্বাস করে হনুমান সাগর ডিঙ্গিয়েছিল; কিন্তু স্বয়ং রামচন্দ্রকে সাগর বন্ধন করে পার হতে হয়েছিল। বিশ্বাসের এমনি জোর। আমার বিশ্বাসই কি সহজে হয়েছিল হে! তুমি ত তবু ব্রহ্ম মানো, আমি কিছুই মানতাম না, তার ওপর মদ মেয়েমানুষে ডুবে ছিলাম। অনেক দেখে, অনেক ঠেকে তবে ওঁর পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি; ওঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলে জেনেছি। যাক এ সব তর্ক। এখন একটা কাজের কথা বলি শোন। শ্যামপুকুরের এই ছোট বাড়ীতে ঠাকুরের কষ্ট হচ্ছে, তার ওপর কি রকম লোকের ভীড় জমেছে দেখছ ত? ডাক্তার সরকার বলছিলেন একটা ফাঁকা জায়গায় ওঁকে রাখা উচিত।

ভবনাথ—আজ্ঞে তা ঠিক বলেছেন। কিন্তু আমরা ত সব ছন্নছাড়ার দল। কারু হাতে পয়সা একটাও নেই। বড় বাড়ী নিলে তার ভাড়া জোগাতে হবে ত।

নরেন্দ্র—এই দেখ মেয়েলী মন। কাজটা যখন করা উচিৎ মনে হয়েছে তখন করতেই হবে; টাকার জন্যে ভাবনে কি চলে? কাজ আরম্ভ কোরলে টাকা আসবেই। ঐ সব মেয়েলী 'ভাবের' ফলে পুরুষকার হারিয়েছিস, নিজের শক্তিতে বিশ্বাস হারিয়েছিস। আচ্ছা সুরেন্দ্রবাবুকে বলে দেখবো, তিনি ত ডাফ্ট্ কোম্পানীর মুৎসুদ্দি, একটা মাসিক বাঁধা আয় আছে।

গিরিশ—ওহে তাঁর ব্যবস্থা কাউকে করতে হবে না। নিজের জোগাড় নিজেই ক'রে নেবেন।

নরেন্দ্র—তবে আর এত ভাবনা কিসের। আর তাঁর যন্ত্রণা ভোগই বা কিসের! দেখ উনি অসাধারণ লোক, একথা মানি। জীবনের যে সব উঁচু আদর্শ তিনি আমাদের দেখিয়েছেন সেই ছাঁচে আমাদের নিজেদের তৈরী করা উচিত। কিন্তু তাঁকে অবতার বলে, দেবতা বানিয়ে, ঈশ্বরকে খাটো কোরো না।

গিরিশ—ঠাকুর বলেন এদের জ্ঞান হয় না, যার বাঁকা মন, যার শুচিবাই আর যারা সংশয়াত্মা। তোমার এই সংশয় কাটাও নরেন, নইলে কিছু হবে না।

নরেন্দ্র—অনেক ত ধ্যান ধারণা করলাম, কিছুই হল না—তাই এক একবার মনে হয় এ সব বাজে।

গিরিশ—তুমি এদিকে বিদ্যাসাগর মশায়ের স্কুলে মাষ্টারী করছ, আবার এবার আইন পরীক্ষা দেবে বলে তৈরী হোচ্ছ, আবার ঈশ্বরকেও চাই। যা হোক একটা ধর হে!

নরেন্দ্র—কি করি বল, বাড়ীর মামলাটা লেগেই আছে। মা ভাইদেরও দেখতে হয় অথচ প্রাণটা আমার ছট্‌ফট্‌ কোরছে সত্যকে জানবার জন্য।

গিরিশ—অমৃত সমুদ্রের পারে দাঁড়িয়ে শান্তি শান্তি কোরে কোথায় মরীচিকার পেছনে ছুটছো? তর্ক ছাড়ো ভক্তি ধরো।

ভবনাথ—ঠাকুরের কথামত ধ্যান ধারণা করো, নিশ্চয় শান্তি পাবে।

নরেন্দ্র—অনেক কোরে দেখলাম, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ লাভ হয় কৈ? আচ্ছা তোমাদের কথায় বিশ্বাস করেই এবার ধ্যানে বসবো, কিন্তু যদি তাতেও ব্রহ্ম দর্শন না হয় তাহলে চেঁচিয়ে বলে বেড়াব সব বাজে, সব ধাপ্পা।

গিরিশ—দেখ দেখ, পাগলা বলে কি? আচ্ছা আমি গিয়ে ঠাকুরকে একথা বলছি।

নরেন্দ্র—না, তিনি যদি অবতার হন তবে ত অন্তর্য্যামী। আমার মনের কথা জেনে আমাকে সিদ্ধি দিতে হবে—নইলে বুঝব এ সবই মিথ্যা।

ভবনাথ—ঠাকুরের শক্তিতে তোমার এখনও অবিশ্বাস নরেন? যিনি লাল জবা গাছে সাদা ফুল ফোটাতে পারেন, ফাঁসীর আসামী যাঁর কৃপায় প্রাণ পায়, যাঁকে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকায় বসে দেখেছেন এবং কথা কয়েছেন, তাঁর শক্তিতে অবিশ্বাস?

নরেন্দ্র—ও বিভূতি, magic, ও শক্তি আমি তিন দিনে পেতে পারি। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে যিনি উপলব্ধি করাতে পারেন, যিনি নির্বিকল্প সমাধি দিতে পারেন, তিনিই যথার্থ গুরু। দেখ, G. C. সম্প্রতি আমি বৌদ্ধ মতের কতক বই পড়ছি। ত্রিপিটক, ললিতবিস্তর

—এসব বেশ লাগছে। বুদ্ধদেবকে আমার বরাবরই বড় ভাল লাগে। একবার আমি ধ্যানে তাঁর দর্শন······

(ঠাকুরের প্রবেশ)

ঠাকুর—কি গো কি সব কি কথা হচ্ছে ?

গিরিশ—আপনি আবার এই অসুস্থ শরীরে উঠে এলেন কেন ?

ঠাকুর—ঐ ঘরে বড় ভীড় হয়েছে। মাকে বলি একটা ফুটো ঢাক, তা রাতদিন এটাকে বাজালে আর ক'দিন টিক্‌বে ? (বাহিরের দিকে দেখিয়া) এই রে ডাক্তার এসেছে, এখুনি ব'কবে—

(ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার মহেন্দ্র মাষ্টারের সহিত প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার সরকার আসিযা নমস্কার করিলেন। মাষ্টার প্রণাম করিলেন।)

ঠাকুর—(হাসিতে হাসিতে) আজ বেশ ভাল আছি।

ডাঃ সরকার—তাই বলে ওঠা হাঁটা কোরছ, কথা বোলছ ? বলেছি না, কথা একেবারে বোলবে না ; (হাসিয়া) অবশ্য আমার সঙ্গে ছাড়া।

ঠাকুর—তুমি একজন মস্ত ডাক্তার, কত নাম, কত পণ্ডিত, তোমার সঙ্গে কি কথায় পারি গা।

নরেন্দ্র—আমি আসছি (গিরিশকে) এসব কথা ওঁকে বোলো না।

(নরেন্দ্রের প্রস্থান)

ডাঃ সরকার—তারপর তোমার ভাবটাব গুলো একটু কমিয়েছ? না, তেমনি তিড়িং বিড়িং করে ওঠ। ভাব না কমালে কিন্তু রোগ কমবে না।

ঠাকুর—আমি কি করবো? সেই অবস্থাটা এলে বেহুঁস হয়ে যাই, কি করি কিছুই জানতে পারি না। তোমার ঘা ফা এক পাশে পড়ে থাকে। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী।

ডাঃ সরকার—যন্ত্র তো বলছ। হয় তাই বলো, নয় চুপ করে থাকো। যন্ত্র ত লোকের সঙ্গে অত বকো কেন?

গিরিশ—মশাই যা মনে করেন; কিন্তু তিনি করান তাই করি, একথা কি অস্বীকার কোরতে পারেন? A single step against Almighty's will কেউ যেতে পারে?

ডাঃ সরকার—Free will তিনি দিয়েছেন ত। আমি মনে করলে ঈশ্বর চিন্তা কোরতে পারি, আবার মনে না করলে নাও পারি।

গিরিশ—আপনার ঈশ্বর চিন্তা বা অন্য কোন সৎকাজ ভাল লাগে বলে করেন। আপনি করেন না, সেই ভাল লাগাটা করায়।

ডাঃ সরকার—কেন, আমি কর্ত্তব্য বলে করি—

গিরিশ—সেও কর্ত্তব্য কর্ম্ম করতে ভাল লাগে বলে। আর কর্ত্তব্যই বা কেন করেন?

ডাঃ সরকার—মনের inclination বলে।

মাষ্টার—(হাসিয়া) পোড়া স্বভাবে টানে। যদি এক দিকে ঝোঁকই হোল, free will কোথায় ?

ঠাকুর—"তোমার কর্ম্ম তুমি কবো, লোকে বলে করি আমি"। কি রকম জানো। বেদান্তে একটা উপমা আছে। একটা হাঁড়িতে ভাত চড়িয়েছ ; আলু বেগুন সব ভাতে দিয়েছ। খানিক পরে আলু বেগুন ভাত লাফাতে থাকে, যেন অভিমান কোরছে "আমি লাফাচ্ছি"। ছোট ছেলেরা ভাবে আলু পটল বুঝি জ্যান্ত, তাই লাফাচ্ছে। যাদেব জ্ঞান হয়েছে তাবা কিন্তু বুঝিয়ে দেয় যে আলু পটল বেগুন এবা জ্যান্ত নয়। নিজে লাফাচ্ছে না। হাঁড়িব নীচে আগুন জ্বলছে, তাই ওরা লাফাচ্ছে। যদি কাঠ টেনে নাও তাহলে আব নড়ে না !

মাষ্টাব—বিদ্যাসাগর মশায়ও কিন্তু অভিমান কোবে বলেন, "ঈশ্বরকে ডাকবাব আব কি দবকাব ! চেঙ্গিস খাঁ ভারতবর্ষ লুটপাট কোবলে, ক্রমে একলক্ষ বন্দী জমে গেল। সেনাপতি বল্লে, এদের খাওয়াবে কে ? ছেড়ে দিলেও বিপদ। চেঙ্গিস খাঁ বল্লে—কচাকচ কোবে কেটে ফেল। এই হত্যাকাণ্ড ত ঈশ্বর দেখলেন, নিবাবণ ত কবলেন না।" কাজেই তিনি বলেন, ঈশ্বর থাকেন থাকুন, আমাব কোন দবকাব নাই।

ঠাকুর—ঈশ্বেরর কাজ কি কিছু বোঝা যায় ? তিনি সৃষ্টি, পালন, সংহার সবই কোরছেন। তিনি কেন সংহার কোরছেন আমরা

কি বুঝতে পারি ; আর বোঝবার দরকারই বা কি ? আধপো মদে যদি তুমি মাতাল হতে পারো ত শুঁড়ীর দোকানে কত মদ আছে এ হিসেবে তোমার দরকার কি ?

ডাঃ সরকার—আর ঈশ্বরের মদ infinite, সে মদের শেষ নাই।

ঠাকুর—ঈশ্বরকে আমমোক্তারী দাও। তার ওপর সব ভার দাও। সৎলোককে যদি কেউ ভার দেয় তিনি কি অন্যায় করেন ? কোলকাতার লোকগুলো বলে ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ ; কেন না তিনি একজনকে সুখে রেখেছেন, আর একজনকে দুঃখে রেখেছেন। শালাদের নিজের ভেতর যেমন, ঈশ্বরের ভেতরও তেমনি দেখে।

গিরিশ—তুমি তাদের উদ্ধার করো দেব! (বলিয়া ঠাকুরের পায়ের ধুলা লইলেন)।

ডাঃ সরকার—দেখ গিরিশ, তোমরা এমন ভাল লোকটার মাথা খাচ্ছ। যা খুসী করো, ওঁকে ঈশ্বর বানিয়ে পূজো ক'রো না। (ঠাকুরকে) আর তুমিই বা কেমন ? সবাইকে অমন পায়ের ধুলো দাও কেন ?

ঠাকুর—আমি কি ওদের নিতে বলি গা ?

মাষ্টার—কেন, আপনি যে বলেন laboratory তে experiment এর সময় ভগবানের আশ্চর্য্য সৃষ্টি দেখে ভাব হয়। তা যদি হয়, তবে ঈশ্বরকে কেন না মাথা নোয়াব ? মানুষের হৃদয়েই ঈশ্বর আছেন। হিন্দু ধর্ম্মমতে সর্ব্বভূতে নারায়ণ, আপনাদের ব্রাহ্মদের বোধ হয় এটা তত জানা নাই।

ডাঃ সরকার—তবে আর কি, দু'ধারে যত জীব দেখবে প্রণাম ক'রে যাও।

মাষ্টার—(ঠাকুরকে দেখাইয়া) ইনি যেমন বলেন, কোন কোন আধারে তাঁর বেশী প্রকাশ। সূর্য্যের প্রকাশ যেমন জলে, আর্শিতে ; জল সব জায়গায় আছে, কিন্তু নদীতে পুষ্করিণীতে বেশী প্রকাশ। ঈশ্বর সকলের মধ্যেই আছেন কিন্তু অবতারে তাঁর প্রকাশ বেশী। ঈশ্বরকেই প্রণাম করা হয়—মানুষকে নয়।

ঠাকুর—তুমি যদি একে ঢং মনে করো তবে তোমার সায়েন্স মায়েন্স সব ছাই পড়েছ।

ডাঃ সরকার—মশায় যদি ঢং মনে করি তা'হলে কি এত আসি। এই দেখ সব কাজ ফেলে এখানে আসি। কত রোগীর বাড়ী যেতে পারি না। এখানে এসে ছ'সাত ঘণ্টা কেটে যায়। তাই ব'লে আমি তোমায় ঈশ্বর বলে মানি না।

ঠাকুর—আমি কি মানতে বলছি গা ?

গিরিশ—উনি কি আপনাকে মানতে বলছেন ?

ডাঃ সরকার—(ঠাকুরের প্রতি) তুমি কি বলছ ? ঈশ্বরের ইচ্ছা !

ঠাকুব—তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত একটি পাতারও নড়বার যো'নাই। আচ্ছা এখন যে চারিদিকে হরি-সভা, নাম সংকীর্ত্তন, ব্রাহ্মসমাজ দেখছ ; এসব কি ছিল ? কেমন সব হয়ে গিয়েছিল। ছোকরারা সব

ইয়ং বেঙ্গল ; এরা কি ভক্তি টক্তির ধার ধারত ? মাথা নুইয়ে পেরণাম কোরতেও জানত না ! এরা ক্রমে মাথা নোয়াতে শিখেছে। এখন দেখো দেশের ভেতরে ভেতরে একটা ধর্ম্মের স্রোত বইছে। এ কার ইচ্ছায় ?

ডাঃ সরকার—যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা, তবে তুমি অতো বকো কেন ? লোকদের জ্ঞান দেবার জন্য অত কথা কও কেন ? (ঠাকুর উত্তর দিতে গেলেন) চুপ করো ; আর ব'কো না। ওঘরে চলো। গলাটা একবার দেখি। তারপর যদি তিড়িং বিড়িং না করো, তবে নরেনের একটা গান শুনবো।

ঠাকুর—মায়ের নাম শুনলে আমি যে ভাব চাপতে পারি না, কি করি বল !

ডাঃ সরকার—ও ভাল নয়। নিজের ভাব চাপতে হয়। আমার ভাব কেউ বুঝলে না। My best friends আমাকে কঠোর নির্দ্দয় মনে করে; কেননা আমি কারু কাছে আমার মনের ভাব প্রকাশ করি না।

ভবনাথ—আপনি অন্যকে ঘৃণা করেন ; তাই কারু পায়ের ধূলো নেন না, বা অন্য কেউ নিলে চটে যান।

ডাঃ সরকার—সে কি হে ! আমি কি এঁর পায়ের ধূলো নিতে পারি না ? এই দেখ নিচ্ছি—

(ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ)

গিরিশ—(সানন্দে) দেবগণ এই মূহূর্ত্তটাকে ধন্য ধন্য করছেন। মহা-পণ্ডিত বিদ্বান ডাঃ মহেন্দ্র সরকার আজ একজন মুখ্যু বামুনের পায়ের ধুলো নিচ্ছেন !

ডাঃ সরকার—তা পায়ের ধূলো নেওয়া কি আশ্চর্য্য। আমি যে সকলেরই নিতে পারি। এই দাও দাও—

(সকলের পায়ের ধূলা গ্রহণ)

ঠাকুর—(সোল্লাসে) ওরে দেখ দেখ ঈশ্বরের লীলা দেখ !

(দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ হইয়া গেলেন। দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া ভাবে মগ্ন, মাষ্টার পাশে দাঁড়াইয়া ধরিলেন, যাহাতে না পড়িয়া যান। অন্যান্য সকলে প্রণাম করিল।)

যবনিকা

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাশীপুরের বাগানের একাংশ।
ভবনাথ ও রাখাল কথা
কহিতেছে।

ভবনাথ—নরেন কোথায় জানো? পরশু থেকে ত তার দেখা পাচ্ছি না।

রাখাল—বোধ হয় পালিয়েছে 'দক্ষিণশ্বরে, পঞ্চবটীতে ধ্যান কোরবে বলে।

ভবনাথ—ঠাকুরের এই অবস্থা। এ সময় ত এক দিনও সে বাইরে কোথাও থাকে না। ক'দিন থেকে বাড়ী পর্য্যন্ত যায় নি।

রাখাল—তা তার জন্যে তোর এত ছট্‌ফটানি কেন? সাধে কি ঠাকুর বলেন, ভবনাথ আর জন্মে নরেনের মাগ ছিল। দু'দিন দেখতে পাসনি, অমনি হা নরেন, হা নরেন।

ভবনাথ—তা নয়, একটা কানা ঘুসো কানে এলো, নবেন নাকি পালিয়েছে; আর এখানে আসবে না।

রাখাল—বলিস কি! কে বল্লে?

ভবনাথ—আচ্ছা তারক আর কালী আছে কিনা জানো?

রাখাল—কেন তারাও গেছে নাকি? (ভাবিয়া) কথাটা সত্যি

হতেও পারে। সত্যিই ত তারক আর কালীকে এই ক'দিন দেখিনি। গেল কোথায় ওরা ?

ভবনাথ—শুনছি নাকি বুদ্ধগয়ায় গিয়েছে। কিছুদিন থেকে নরেন ললিতবিস্তর আর ত্রিপিটক পড়ছিল, তাই বোধ হয় বুদ্ধদেব তাকে টেনেছেন। ও যে কিছুদিন থেকে অস্থির হয়ে উঠেছে। খালি বলে ধ্যান ধারণা সব মিথ্যে, জীবনটাই বৃথা গেল, ব্রহ্ম দর্শন হোল না।

রাখাল—নরেনেব যা দর্শন হয়, আমাদের তার কিছুই হয় না, তবু ওর তৃপ্তি নেই।

ভবনাথ—ব্যাপারটা আর ত চেপে বাখা উচিত নয়। ঠাকুরকে বলা উচিত।

বাখাল—ক্ষেপেছিস, কোথায় যাবে তারা ? এখানের ভাবের আফিং যে খেয়েছে সে কোথাও গিয়ে থাকতে পাববে না। এদিক ওদিক যাচ্ছে বটে কিন্তু ফিবে তাদেব আসতেই হবে।

ভবনাথ—কিন্তু নবেনকে জান ত। তাব যা গোঁ। সে গেছে যখন এমনি ফিববে কি ?

রাখাল—মহিম মুখুজ্জ্যে সব তীর্থ দর্শন কবে এসে শেষে কিনা ঠাকুবকে দেখিয়ে বল্লেন সব তীর্থ এইখানেই। বিজয় গোঁসাই, নাগ মশায়, কেশব সেন সবাই ঐ এক কথাই বলেন। নবেন যাবে কোথায় ?

ভবনাথ—না ভাই সে বড় অভিমানী। সেদিন ঠাকুরকে খুব ধরেছিল, "নির্ব্বিকল্প সমাধি দিন।" ঠাকুর বল্লেন "আমি ভাল হলেই তুই যা চাইবি দোব।" নরেন বল্লে, "আপনি যদি আর ভাল না হন, তাহলে আমার কি হবে?"

রাখাল—তারপর?

ভবনাথ—ঠাকুর বল্লেন "শালা বলে কি?" কিন্তু আমি দেখলাম অভিমানে নরেনের ঠোঁট ছ'টো ফুলতে লাগলো; সে বুঝলে ঠাকুর তাকে ঐ অবস্থা দিতে চান না। আমার মনে হয় সেই অভিমানে সে চলে গেছে।

রাখাল—তোর কথা সত্যি হতেও পারে। কারণ আমার সামনে একদিন নরেন ঠাকুরকে বলছিল "আমাব ইচ্ছে হয় শুকদেবের মত একেবারে পাঁচ ছ' দিন ক্রমাগত সমাধিতে ডুবে থাকি, তারপর শরীর রক্ষার জন্যে খানিকটা নীচে এসে আবার সমাধিতে চলে যাই।"

ভবনাথ—ঐ ওর ঝোঁক, ভক্তিমার্গ ওব ভালো লাগে না। বলে "চাই শান্তি—সত্যম জ্ঞানমনন্তম্।" তা ঠাকুর কি বল্লেন?

রাখাল—চটে গিয়ে গাল দিয়ে বল্লেন, "ছি ছি তুই এত বড় আধার; তোর মুখে এই কথা। তুই শুধু নিজের মুক্তি চাস্? এতো তুচ্ছ, অতি হীন কথা। অত ছোট নজর করিস নি।" নরেন কাঁদতে লাগলো।

ভবনাথ—তাইত ভয়, সে অভিমান করে চলে গেছে ; আর এখানে আসবে না।

(গিরিশের প্রবেশ)

গিরিশ—কে আসবে না ? কার কথা বোলছ ?

রাখাল—নরেনরা গয়া পালিয়েছে ; তারা নাকি আর আসবে না—

গিরিশ—এখানে যে শালা এসেছে সে শালা কি আর কোথাও গিয়ে থাকতে পারে ? দেখে এলুম তিন ছোঁড়াই গুটি গুটি করে ফিরে এসেছে। বুদ্ধদেব মাথায় উঠেছেন। ফিরে এসে আব মুখ দেখাতে পারছে না।

ভবনাথ—এঁ্যা বলেন কি ! এসেছে, কৈ ?

গিরিশ—থাম্‌না ছোঁড়া ; সব আসছে। যে দিন গিয়েছে তারপর দিন থেকে ঠাকুরেব অসুখের কোন খবর না পেয়ে ছোঁড়াগুলো আই ঢাই কোবতে শুরু করেছিল। কোন রকমে দু'দিন ছিল ; তারপর কাশী বৃন্দাবন মাথায় উঠল ; সোজা এখানে এসে হাজির। তবু নরেনটা মানবে না, যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই এই রামকৃষ্ণ।

ভবনাথ—চলুন যাই, দেখি গিয়ে ওদের খাওয়া দাওয়া হোয়েছে কি না।

(গিবিশ ছাড়া সকলে চলিয়া গেল। গিরিশ গুণগুণ করিয়া 'জয় বামকৃষ্ণ' বলিতে বলিতে পদচারণা করিতে লাগিলেন অভিনেত্রী বিনোদিনীর প্রবেশ। বয়স আন্দাজ বছর ২৫।)

অভিনেত্রী—বাবা।

গিরিশ—কে ? ও তুই, বিনী ! এখানে কেন ? হ্যাঁ রে, সারা রাত ত তোদের থিয়েটারে কাটাই, তবু হয় না ! এখানে আসি দু'দণ্ড একটু শান্তি পাবার জন্যে, তা এখানেও তোদের সাত ঝামেলা নিয়ে বিরক্ত কোরবি ?

বিনোদিনী—না বাবা, থিয়েটারের কোন কথা বলতে আসি নি।

গিরিশ—তবে ?

বিনোদিনী—বাবা, ঠাকুরকে একবার দেখব ; তাঁর পা দুটো ছুঁয়ে আর একবার প্রণাম কোরব।

গিরিশ—সে কি ? তোকেও টেনেছেন নাকি ? নাঃ, ঠাকুর দেখছি এবার থিয়েটারটাও ভাঙ্গবেন।

বিনোদিনী—সেদিন যখন চৈতন্য-লীলা অভিনয়ের পর ঠাকুর থিয়েটারের ভেতরে আপনার সঙ্গে কথা কইছিলেন, আমি তাঁকে প্রণাম কোরেছিলাম ; তারপর থেকে আমার মনটা কেমন হয়ে গেছে। সংসারের আর কিছু ভাল লাগে না। কিন্তু বাবা আমরা সমাজের অতি হীন স্তরের লোক। পাপের ব্যবসায় ডুবে আছি। এ নরক থেকে উদ্ধার পাব না জানি ; তবু তাঁকে আর একবার দেখতে, তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরবার জন্যে প্রাণটা কেমন আকুলি বিকুলি কোরছে। তার ওপর শুনলাম ওঁর নাকি খুব অসুখ, তাই ছুটে এসেছি বাবা। আমাদের মত নরকের

কীট তাঁকে ছোঁবার যোগ্য নয় জানি, তাই আর কাউকে একথা বোলতে সাহস করি নি। আপনি এর একটা উপায় কোরে দিন বাবা। শুনেছি অসুখের জন্যে তিনি আর বাইরে বের হতে পারেন না। একবার ভেতরে গিয়ে তাঁর দেখা পাব না ?

গিরিশ—তাইত রে! তুই যে খুব বিপদে ফেল্লি! রাখাল, নরেন এরা সব এখন নিয়ম কোরেছে যে বাইরের কেউ ঠাকুরকে ছোঁবে না। বহু পাপী তাঁকে স্পর্শ কোরে পাপমুক্ত হয়েছে, আর সেই পাপ নিজের শরীরে নেওয়াতেই ঠাকুরের গলায় এই ব্যাধি হয়েছে, তাই আমরাও আর সহজে ঠাকুরকে ছুঁই না। ওরা সব পাহারা দিয়ে রাখে। নেহাৎ জানা চেনা না হোলে বাইরের লোককে ওঁর কাছে এখন যেতে দেয় না। অসুখটাও এখন খুব বেড়েছে।

বিনোদিনী—তাইত বাবা, তবে কি তাঁর দেখা আর পাব না ? আমি যে অনেক আশা করে এসেছি। আমি জানি আমার পরিচয় পেলে এরা ঠাকুরকে ছুঁতে দেওয়া দূরের কথা, ঐ বাড়ীর ছাওয়াও মাড়াতে দেবে না। কিন্তু তাঁকে দেখবার জন্যে আমার মন যে আছাড় বিছাড় কোরছে। আচ্ছা আমি যদি ওখানে যাই, আমায় না হয় ওরা গাল মন্দ দেবে, নয়ত চুলের মুঠি ধরে তাড়িয়ে দেবে, তা আমি সইতে পারব! কিন্তু ঠাকুর কি রাগ কোরবেন ?

গিরিশ—ওরে তিনি যে করুণাসিন্ধু, তিনি কি কারো ওপর রাগ করেন!

বিনোদিনী—রাগ কোরবেন না ? তবে আমি যাবো, কোন ঘরে আছেন বোলে দিন ; আমি সোজা গিয়ে ঠাকুরের পা তুটো জড়িয়ে ধরবো। তার পর ওরা আমায় তাড়িয়ে দেয় দেবে। আমাব মন খালি বোলছে উনিই আমার ইষ্ট, উনিই আমার স্বয়ং ভগবান। পাপীর স্পর্শে ওঁর কোন ক্ষতি হবে না বাবা! (গিয়িশকে চিন্তিত দেখিয়া)—আমার পাপ আমারই থাকবে, ওঁকে তা নিতে হবে না। আচ্ছা, আমি ওঁকে ছোঁব না বাবা, শুধু দূর থেকে দেখে চলে আসব।

গিরিশ—বুঝেছি ; তোর বোধ হয় সময় হোয়েছে ; ঠাকুর তোকেও টেনেছেন।

বিনোদিনী—সে ভাগ্য কি আমার হবে বাবা। আমরা যে নরকের কীট, নটী, বেশ্যা—

গিরিশ—ওরে ঠাকুর বলেন হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্মজন্মান্তরের পাপও মায়ের একবার কৃপা দৃষ্টিতেই দূর হয়।

বিনোদিনী—তবে! আপনার পায়ে পড়ি বাবা, আমাকে একবার ঠাকুরের কাছে নিয়ে চলুন। আমি শুধু দূর থেকে দর্শন কোরেই চলে আসবো।

(গিরিশের পদ ধারণ)

গিরিশ—ওরে ছাড়, ছাড়। এসব নন্দী ভৃঙ্গীর পা ধোরে কি হবে; যার পা ধোরলে কাজ হবে তারই পা ধরগে। চল আমার সঙ্গে। আমার মত পাপীর ভার যখন তিনি নিয়েছেন তখন তোর স্পর্শে আর কিই বা হবে তাঁর। যা হয় আমার হবে, আয় আমার সঙ্গে। (উভয়ে যাইতে গিয়া গিরিশ থমকাইয়া দাঁড়াইল) নাঃ হোল না। নরেনটা ওঁর ঘরে গেল। অন্য সবাইকে এক রকম বোঝাতে পারতুম, ওটা ভারি একরোখা।

অভিনেত্রী—কে, ঐ ছেলেটী ?

গিরিশ—হাঁ, দেখতে অমনি ছেলেটি, কিন্তু ভারি তেজ ; আর জানিস খুব পণ্ডিত। মস্ত বড় যোগী। আজন্ম ব্রহ্মচারী।

বিনোদিনী—তা'হলে দর্শন পাবো না !

গিরিশ—(ভাবিয়া) এক কাজ কর। সন্ধ্যার সময় বেটা ছেলে সেজে চলে আসবি। পুরুষদেরই সহজে কাছে যেতে দেয় না, কাজেই মেয়েছেলে দেখলে ত ঢুকতেই দেবে না ; তার ওপর তোদের জাতের ছাপ ত মুখে চোখে ফুটে রয়েছে।

বিনোদিনী—সেজে আসবো ? ঠকানো হবে না ? ঠাকুর রাগ কোরবেন না ?

গিরিশ—তোর অত ভাবনার দরকার কি ? তুই অভিনেত্রী, সাজাই তোর পেশা। পরের মন ভুলিয়ে টাকা উপায় করিস, সেটা সাজা নয় ? তোর মন হয়ত চাইছে এক, মুখে বলছিস অন্য কথা, সেটা

ঠকান নয়? এ ত ভাল কাজ, ঠাকুরের দর্শনের জন্যে না হয় সাজলি, ঠকালি। শ্রীকৃষ্ণকে পাবার জন্য শ্রীমতী ত কত সাজেই সেজেছিলেন।

বিনোদিনী—কিন্তু ঠাকুর যদি রাগ করেন?

গিরিশ—তা'হলে ওঁর কাছে যাওয়াই মিছে। ওরে, উনি মন দেখেন; তা ছাড়া উনিই যে তোকে টেনেছেন বুঝছি। আচ্ছা এক কাজ কর। সাজবিই যখন, তখন এমন সাজে সাজবি যেন সব শালা ঠকে যায়, আর তোকে কেউ না আটকায়। সাহেব সেজে আসবি।

বিনোদিনী—সাহেব? কথা বোলব কি কোরে?

গিরীশ—না, না, গোরা সাহেব নয়, দেশী সাহেব। আর কথা বেশী বোলবি না। এক কাজ করবি, কালীপদকে সঙ্গে আনবি। তাকে এখানে সবাই জানে আমার লোক বলে। সে এসে বোলবে গিরিশ বাবু এঁকে পাঠিয়ে দিয়েছে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা কোরতে, ইনি গিরিশ বাবুর খুব জানা চেনা। তার পর সটান ঠাকুরের কাছে নিয়ে যাবে। বোলবি কারু সঙ্গে যেন বেশী কথা না বলে। হ্যাঁ, একটা গোঁপ টোপ লাগিয়ে আসবি, নইলে মুখ দেখে ধরে ফেলবে; বিশেষ ভয় ঐ নরেনটাকে। সব দিকে ওর খর দৃষ্টি।

বিনোদিনী—কিন্তু এতে আপনার ক্ষতি হবে না তো বাবা?

গিরিশ—আমার ক্ষতি কিরে? আমার লাভ ক্ষতি সব যে আমি

ঠাকুরের পায়ে দিয়েছি। লাভ লোকসানের হিসেব নিকেশ সব চুকিয়ে খাতায় তিন শূন্য টেনে বসে আছি।

বিনোদিনী—বাবা, আশীর্ব্বাদ করুন, ঠাকুর যেন আমার ওপরও অমনি কৃপা করেন।

(প্রণাম করিল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(কাশীপুরের বাড়ী। ঠাকুর পদচারণা করিতেছেন। মাঝে মাঝে যেন মায়ের সঙ্গে কথা কহিতেছেন)

ঠাকুর—মা, মাগো, বড় যন্ত্রণা হচ্ছে মা। কেন এত কষ্ট দিচ্ছিস? ও যন্ত্রণা ত খোলের, এই পঞ্চভূতের দেহটার—তাও বটে। না মা না, ব্রহ্মে লীন হতে চাই না। বার বার এমনি দেহ ধারণ করে যেন তোর লীলা আস্বাদন কোরতে পারি। তোর এই বিচিত্র মায়া, তোর নানা খেলা—এ দেখতে বড় ভাল লাগে। হোক আমার যন্ত্রণা ; হ্যাঁ হ্যাঁ এও ত তোর ইচ্ছা, এও ত তোর লীলা।···বারো জনকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিয়েছি ; এই যথেষ্ট, কি বলিস?···নরেনটা বড্ড ধরেছে, দে মা ওকে ব্রহ্মজ্ঞান··· দিবি নে? ও তাও তো বটে, ওকে যে অনেক কাজ করতে হবে—তবে ওকে শক্তি দে। (নিজেকে দেখাইয়া) এখান থেকেই দিতে হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাও তো বটে, এতে আর আমার কি হবে, এই দেহটার তো যাবার সময় হয়েছে।

(নরেন্দ্র, রাখাল, লাটু ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে আসিয়া প্রণাম করিল। সকলেরই দীন বেশ, কিন্তু গেরুয়াধারী নহে।)

কিরে, ফিরলি তোরা? আহা হা সব মুখ শুকিয়ে গেছে। বড্ড কষ্ট হোয়েছে তোদের, না?

নরেন্দ্র—কষ্ট আবার কিসের ? সন্ন্যাসীর আবার কষ্ট কিসের ?

ঠাকুর—(পরম স্নেহে গায়ে হাত বুলাইয়া) ওরে না না তোরা সব আমার মায়ের ছেলে। আমি থাকতে তোরা সন্ন্যাসী নস। এ দেহটা-যাক, তারপর তোদের যা ইচ্ছা করিস।

লাটু—সন্ন্যাসী নই তবে ভিক্ষে করসি কেন ?

ঠাকুর—তুই ছোঁড়া কি বুঝবি ? বুঝেছে ওরা ; বড় লোকের ছেলে, লেখাপড়া শিখে পণ্ডিত হোয়েছে, অথচ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে ঘুরছে। ওরে এতে তোদের অহংটা নষ্ট হবে, আর দেশের গরীব দুঃখীর সঙ্গে নাড়ীর পরিচয় হবে। নিজেরা দুঃখ না পেলে পরের দুঃখ কেউ সত্যি কোরে বোঝে না। তো'দিকে যে অনেক কাজ করতে হবে। তার জন্যে শরীর আর মনকে তৈরী করতে হবে।

লাটু—কাজ কোরব, ভিক্ষে কোরব, ত ধ্যান কোরব কখন ?

ঠাকুর—কার ধ্যান কোরবি রে নেটো ? তোদের আশে পাশে মানুষ যদি কষ্ট পায়, শুধু নিজেদের মুক্তি নিয়ে কি করবি ? মানুষের পূজোতেই যে মায়েব পূজো, প্রতি মানুষের মধ্যেই যে সেই ব্রহ্ম, সেই চিৎশক্তি রয়েছেন। নিঃস্বার্থ ভাবে মানুষের সেবাতেই যে ভগবানের সেবা করা হয়—এই সত্যই ত তোদের জানতে হবে, দশ জনকে জানাতে হবে।

(প্রভুদযাল মিশ্র বাহির হইতে বলিলেন)

প্রভুদয়াল—ভেতরে আসতে পারি ?

ঠাকুর—কে গো ? আরে মিশ্র মশায়, এসো এসো।

(প্রভুদয়ালের প্রবেশ ও প্রণাম। তাঁহার পরণে খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজকের বেশ, কিন্তু তাহার রং গেরুয়া। ঠাকুর দুহাত তুলিয়া তাঁহাকে সবিনয়ে নমস্কার করিলেন।)

তারপর খবর কি ? অনেক দিন যে আসো নি ?

প্রভুদয়াল—শুনলাম আপনার অসুখ নাকি খুব বেড়েছে ?

ঠাকুর—মায়ের দেওয়া এই শরীর, অসুখও তাঁরই দেওয়া। তবে হ্যাঁ, মাঝে মাঝে বড় যন্ত্রণা হয়। বেশী কষ্ট হয় কিসে জানো, মায়ের নাম গাইতে পারি না! গলায় ঘা কিনা। তারপর, যোগ ধ্যান কোরছ ত ?

প্রভুদয়াল—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার কৃপায় জ্যোতি দর্শনাদি বেশ হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, যে আমি খ্রীষ্টের মুর্ত্তি ধ্যান করি কিন্তু সেখানে ভেসে ওঠে আপনার ছবি। Jessus Christ আর আপনি একই।

ঠাকুর—নরেন, এ কি বলে রে ?

নরেন্দ্র—যে যাই বলুক মশাই, নিজে যতক্ষণ না বুঝব ততক্ষণ আমি স্বীকার কোরব না যে আপনি ভগবান ; এতে ভগবানকে ছোট করা হয়। (প্রভুদয়ালকে) আচ্ছা আপনি ত খ্রীষ্টান, আপনি খ্রীষ্টানদের মত খাওয়া দাওয়া করেন ?

প্রভুদয়াল—না, আমি স্বপাকে হবিষ্যান্ন খাই। অন্যের হাতে খাই না।

নরেন্দ্র—কেন ? আপনি খৃষ্টান হয়ে জাতিভেদ মানেন ?

প্রভুদয়াল—জাতি ভেদ মানি না। তবে যার তার হাতে খেলে যোগাভ্যাসের হানি হয়, তাই খাই না।

নরেন্দ্র—আপনি গেরুয়া পরেন কেন ?

প্রভুদয়াল—ভারতেব ঈশ্বরপ্রেমিক যোগীরা সনাতন কাল থেকে এই পবিত্র গেরুয়া পরে এসেছেন। কাজেই এর চেয়ে প্রিয়তর পরিধান আর কি আছে ! তা ছাড়া বাইরের এই গেরুয়া ভেতরের মনকেও সর্ব্বদা সজাগ রাখে।

রাখাল—আপনার আচার ব্যবহার সবই ত হিন্দুর। তবে আপনি খৃষ্টান হলেন কেন ? আপনি আগে কোন জাত ছিলেন ?

প্রভুদয়াল—আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম। পরে ভাগ্য ক্রমে ঈশা মুশার ওপর বিশ্বাস হয়, কাজেই তাঁকেই ইষ্টদেবতা রূপে গ্রহণ কোবেছি। কিন্তু তাই বলে পিতৃপিতামহের চালচলন ছাড়তে হবে তার কি মানে আছে ? (একটু ইতস্ততঃ করিয়া) বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, বাইরে কোথাও কি জল আছে ?

(নবেন্দ্র ঘবেব ভিতরের কলসী হইতে এক গ্লাস জল লইয়া দিতে গেলেন)।

লাটু—আবে বে, নরেন কোরসো কি ? ওটা ঠাকুরের গেলাস। ও যে খ্রীষ্টান।

(নবেন্দ্র একটু থমকিয়া ঠাকুরের দিকে চাহিলেন।)

ঠাকুর—(হাসিয়া) দে দে, ভক্ত আর ভগবান এক রে। আর তোর বেদান্তমতে সবই ত ব্রহ্ম। আমিও যে, ও-ও সে।

প্রভুদয়াল—(হাঁটু গড়িয়া) Oh kind Lord! প্রভু তোমার এত দয়া! আমার সব তেষ্টা মিটে গেছে। দাও দাও ঐ জল দাও। এ জল গঙ্গাজলের চেয়েও পবিত্র, জেরুজালেমের জর্ডন নদীর জলেব চেয়েও পাপহর।

(জলের গ্লাস মাথায় লইয়া উদ্‌ভ্রান্তেব মত বাহিব হইয়া গেলেন।)

ঠাকুর—ওরে দেখ দেখ। ওকে নিয়ে গিয়ে কিছু খাওয়া!

(সকল ভক্তেবা প্রস্থান কবিল।
ঠাকুব পায়চাবী করিতে লাগিলেন। যন্ত্রণায় গলায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। শেষে কাতব হইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলেন।)

ঠাকুর—মা মা, বড্ড যে যন্ত্রণা হচ্ছে! মা, মাগো···

বিনোদিনী সাহেবের পোষাকে হ্যাটকোট পড়িয়া ছদ্মবেশে প্রবেশ কবিল। কালীপদবাবু তাহাকে ঘবে পৌছাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। বিনোদিনী অপলক নেত্রে কবজোড়ে ঠাকুবের দিকে চাহিয়া ক্রমে নতজানু হইল। ঠাকুর পাশ ফিবিতেই তাহাকে দেখিলেন।

ঠাকুর—কে গা ? আসুন, এস। (উঠিয়া বসিয়া নমস্কার করিলেন)।

বিনোদিনী—(ঠাকুরের পা জড়াইয়া ধরিয়া) ঠাকুর ঠাকুব, আমায় ক্ষমা করো ঠাকুর। আমি চুরি করে তোমার ঘরে ঢুকেছি। তোমায় ছোঁবনা ভেবেছিলাম, কিন্তু থাকতে পারলাম না। আমায় উদ্ধার করো ঠাকুর। আমি বড় পাপী।

(তাহার হ্যাট খুলিয়া গেল। ভিতরের চুল খুলিয়া পিঠে পড়িল।)

ঠাকুর—মা, মা ওঠ মা। এ তোর কি নতুন খেলা মা! (বিনোদিনী মুখ তুলিতে) ওঃ! তোমায় যেন কোথায় দেখেছি, গিরিশের থিয়েটারে না ?

বিনোদিনী—হ্যাঁ বাবা, আমি একজন নগণ্যা নটী। আপনাকে ছুঁয়ে ফেলেছি, অন্যায় কোবেছি। কিন্তু আপনাকে সামনে দেখে, পা দুটো জড়িয়ে না ধবে থাকতে পাবলাম না। আমায় শাপ দিন, শাস্তি দিন ঠাকুব, কোন দুঃখ নাই। আমাব মন আজ কানায় কানায় ভরে উঠেছে। মনে হচ্ছে সব পাপ, জীবনেব সব কলঙ্ক যেন এই মুহুর্ত্তটীতে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমাব এই হৃদয় মন্দিরে আজ দেবতাব অধিষ্ঠান হয়েছে।

(নরেন্দ্র, রাখাল, লাটু ইত্যাদিব প্রবেশ এবং এই অদ্ভুত-বেশী নাবীকে দেখিয়া সাশ্চর্য্যে অবস্থান।)

ঠাকুর—কিরে শালারা, পারলি আটকাতে! শ্যাম-শ্যামার কথা শুনেছিস? এখন দেখ সাহেব শ্যামা। কেমন আয়ান ঘোষের চোখে ধুলো দিয়ে মা আমার সাহেব হয়ে এসেছে। তা হ্যাঁ মা, এলি একটা গান শোনাবি না? আমি যে আজকাল নামগান কোরতে পারি না। আর নরেনটা ত খালি ওষুধ, ডাক্তার, পথ্য, মামলা, চাকরি এই সব নিয়ে ব্যস্ত।

বিনোদিনী—ঠাকুর, এ আমার জীবনের পরম সৌভাগ্য।

—গান—

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে, তারা বেয়ে পড়বে ধারা॥
হৃদি পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে টুটে,
তখন ধরাতলে পড়বো লুটে, তারা বলে হব সারা॥

ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শতশত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্বঘটে,
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির ভরা॥

(বিনোদিনী প্রণাম করিয়া উঠিল)

ঠাকুর—যা, একে নিয়ে গিয়ে কিছু জলখাবার খাওয়া গে। ভক্তি রেখো মা, বিশ্বাস আর ভক্তিই হোল তাঁকে পাবার সহজ পথ। মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকবে। গৃহীর পক্ষে জীবে দয়া, ভক্ত সেবা, আর নাম সংকীর্ত্তনই যথেষ্ট।

(নরেন্দ্র ব্যতীত ভক্তদের ও বিনোদিনীর প্রস্থান।)

ওরে শোন (গমনোদ্যত নরেন্দ্র ফিরিল) দরজাটা ভেজিয়ে দে (নরেন্দ্র দরজা বন্ধ করিল) আয় এখানে বোস (প্রায় কোলের কাছে নরেন্দ্রকে বসাইলেন)। মনটা এত ভার ভার কেন ?

নরেন্দ্র—এত ধ্যান জপ করছি, কৈ ব্রহ্মানন্দ ত পেলাম না—নির্ব্বিকল্প সমাধি ত একবারও হোল না। এ জন্মে কি হবে না ?

ঠাকুর—তোর ঐ এক কথা। নিজের মুক্তির জন্যে ব্যস্ত হতে বারণ করেছি না। তুই এত বড় আধার, একি হীন বুদ্ধি তোর ? সমাধি ত তুচ্ছ কথা, সমাধির পারে যা।

নরেন্দ্র—বারবার ঐ বলে ভোলালে শুনব না।

ঠাকুর—শোন, কাজের কথা শোন। এ খোলটা আর থাকবে না। বড্ড জানাজানি হয়েছে, এবার মা'র ইচ্ছায় এটা ভেঙ্গে যাবে। কাঁদছিস কিরে ? তুই না ব্রহ্মজ্ঞান চাস ? মনের পার না হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। শোন, এইসব ছেলেদের ভার তোর ওপর রইল, তুই তাদের দেখবি।

নরেন্দ্র—(রুদ্ধ কণ্ঠে) না না আমি পারব না (দেহত্যাগের কথা শুনিয়া কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল।) ও, আমি পারব না……

ঠাকুর—পারবি না কি ? তোর ঘাড় পারবে। ওরে মা তাঁর কাজ করবার জন্যে তোকে সংসারে টেনে এনেছেন। তোকে যে অনেক কাজ কোরতে হবে।

নরেন্দ্র—না, আমি পারব না। আমার সে শক্তি কই ?

ঠাকুর—শক্তি! তোর আবার শক্তির অভাব! আয়, সামনে বোস দেখি। দেখি বুকখানা—

(নরেন্দ্র সামনে বসিলে ঠাকুর তাহার বুকে হাত দিলেন।)

নরেন্দ্র—একি, একি হচ্ছে! এযে শক্তির বিদ্যুৎ স্রোত থর থর করে শরীরে ঢুকছে। উঃ এ কি কম্পন! না না, আমি আর নিতে পারছি না। এ ক্ষুদ্র আধারে এত শক্তি ধরে না। উঃ, সব ঘুরছে, শক্তির এ প্রচণ্ড ধাক্কা আমি সইতে পারছি না। এ আপনি কি কোরছেন ?

(মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল, ঠাকুর খানিক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, ধীরে ধীরে তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

নরেন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে জ্ঞান লাভ করিয়া চোখ রগড়াইয়া উঠিল। ঠাকুরের অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে তাকাইয়া সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিল।)

নরেন্দ্র—এ কি। আপনি কাঁদছেন কেন?

ঠাকুর—ওরে আমার যা কিছু ছিল আজ তোকে সব দিয়ে দিলুম। আজ আমি একেবারে ফকির।

নরেন্দ্র—তুমি করুণাময়, তুমি মহামানব।

(প্রণাম করিল, ঠাকুর মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন)।

তৃতীয় দৃশ্য

কাশীপুরের বাগান বাড়ীর কক্ষ। রামকৃষ্ণদেব অসুস্থ; শুইয়া আছেন। ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার আসিলেন। রাখাল, লাটু, রাম, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি ঘরেই বসিয়াছিল; সকলেই বিমর্ষ। ঠাকুরের মুখ দিয়া খানিকটা পুঁজরক্ত বাহির হইল। রাখাল তাহা পিকদানিতে ধরিল।

ডাঃ সরকার—কেমন আছো?

ঠাকুর—(কথা বলিতে পারিলেন না, ইসারায় বলিলেন) বড় যন্ত্রণা।

ডাঃ সরকার—খুব কষ্ট হচ্ছে?

লাটু—কিছু খেতে পারসেন না। সুজির পায়েস কি দুধও গিলতে কষ্ট হচ্ছে।

ডাঃ সরকার—আচ্ছা ভক্তের এত কষ্ট কেন?

ঠাকুর—(রাখালকে ইসারায় বলিলেন) তুই উত্তর দে।

রাখাল—এ কষ্ট শরীরের কষ্ট। আত্মার আবার কষ্ট কি?

ডাঃ সরকার—তবু ওকে ত এই কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। এর কি কোন উদ্দেশ্য আছে?

রাখাল—মাষ্টার মশায় বলেন এই অসুখের ফলে ওঁর অবস্থার পরিবর্ত্তন হচ্ছে, নিরাকারের দিকে ঝোঁক যাচ্ছে। “বিদ্যার আমি” পর্য্যন্ত থাকছে না। আর একটী উদ্দেশ্য লোক বাছা।

কারা অন্তরঙ্গ কারা বহিরঙ্গ তা বোঝা যাচ্ছে, আর ভক্তদের কত উপকার হচ্ছে। সবাই এসে সহজেই জুটতে পাচ্ছে। পাঁচ বছর তপস্যা করে যা না হোত, এই ক'দিনে ভক্তদের তা হয়েছে—সাধনা—প্রেম—ভক্তি।

ঠাকুর—নরেন কোথায় ?

রাখাল—আপনার যন্ত্রণা দেখতে না পেরে, কাল সারা রাত্রি বাগানে "রাম রাম" কোরে ছুটে বেড়িয়েছে আর পাগলের মত কেঁদেছে। দিনে হাইকোর্টে গিয়েছিল তার মোকদ্দমার সাক্ষী দিতে। ফিরেছে, হয়ত এখন ঘুমুচ্ছে।

ঠাকুর—(কষ্টে আস্তে আস্তে বলিলেন) বারোটা বছর আমার মাথার ওপর ঐ রকম ঝড় বয়ে গিয়েছে, ও আর একরাত্রি কেঁদে কি করবে ? দেখ এদিকে বেদান্ত মানে, আবার আমার কষ্ট দেখে চেঁচিয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছে। মহামায়ার এ মায়া কি সহজ গা !

ডাঃ সরকার—যাক, তুমি বেশী কথা বোলো না। একখানা গান হবে না ? আচ্ছা আমি নরেনকে ডেকে আনি।

(ঠাকুর ইসারায় বারণ করিলেন। এমন সময় গিরিশ একটি টিফিন কেরিয়ার লইয়া প্রবেশ করিলেন।)

ঠাকুর—(ইসারায়) ও কি ?

গিরীশ—খিচুরী, আর পায়েস ; আপনার ভোগ হবে।

ডাঃ সরকার—তুমি কি পাগল হয়েছ গিরিশ ? গলার ঘায়ের জন্যে দুধ

পর্য্যন্ত গিলতে কষ্ট হচ্ছে, আর তুমি খিচুরী পায়েস নিয়ে হাজির।

গিরিশ—আমার যে মনে হোল ঠাকুরের এই খেতে ইচ্ছে হয়েছে।

ঠাকুর—মা দেখিয়ে দিয়েছিলেন শেষে পায়েস খেতে হবে, তখন কি জানি যে এমনি করে পায়েস খাওয়া।

গিরিশ—(হাত জোর করিয়া) তুমিই পূর্ণব্রহ্ম, তা যদি না হয় সবই মিথ্যা। তবে কেন এ ছলনা ? তোমার এ কষ্ট আমরা আর দেখতে পারছি না। বল, আরাম হয়ে যাক্। আচ্ছা আমি ঝেড়ে দিই (গলায় হাত বুলাইয়া) কালী, কালী।

ঠাকুব—ওরে আমার লাগবে। ওরে একে তামাক খাওয়া।

গিরীশ—আমায় ভুলিও না। বল না, ভাল হয়ে যাবে।

ঠাকুর—(ইসারায়) সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।

গিরীশ—সে ত তুমিই !

ঠাকুর—(ইসারায়) ছিঃ ওকথা বলতে নেই।

গিরীশ—বল না, তুমি ভাল হয়ে যাবে। এ কষ্ট যে আমরা আব দেখতে পার্চ্ছি না।

ঠাকুর—তোমরা কাঁদবে বলে এত কষ্ট ভোগ কবছি—সব্বাই যদি বলো "এত কষ্ট, তবে দেহ যাক," তা'হলে দেহ যায়।

(সকলে চুপ, কেহ কাঁদিতেছেন .)

গিরীশ—আমরা সবাই চাই তুমি ভাল হও। তুমি মন করলেই নিজেকে সারাতে পারো।

ঠাকুর—ছিঃ। যে মন মায়ের পায়ে দিয়েছি, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এই রক্ত পূঁজওয়ালা ঘায়ে দোব? ওরে এ দেহটা খোল মাত্র, সেই অখণ্ড বই আর কিছু নাই। তোদের মধ্যেও যে, এটার মধ্যেও সেই।

গিরীশ—(করজোড়ে) ভগবান আমায় পবিত্রতা দাও, যাতে কখনও একটুও পাপ চিন্তা না হয়। আনন্দ দাও। খুব মন খারাপ, বড় অশান্তি ঠাকুর—তুমি খেতে পারছো না, আর আমরা দু'বেলা গিলছি, একি কম দুঃখ—

(কাঁদিয়া ফেলিলেন। একে একে টিফিন কেরিয়ার খুলিয়া সামনে রাখিয়া)

ভক্তের এ নৈবেদ্য নেবে না? (নিজেকে দেখাইয়া) এখনও কি এ বাটীর রসুনের গন্ধ যায় নি?

ঠাকুর—ওরে তোর যে পাঁচসিকে বিশ্বাস; ষোল আনার ওপর আরো চার আনা। অত আগুন জ্বললে গন্ধ ফন্দ পালিয়ে যায়! রসুনের বাটী পুড়িয়ে নিলে আর গন্ধ থাকে না; নতুন হাঁড়ি হয়ে যায়। কৈ দে তোর পায়েস। এই দেখ খাচ্ছি, আর দুঃখ কোরিস নি।

(পায়স লইয়া খাইতে লাগিলেন। গিরিশ সাশ্রুনয়নে হাতজোড় করিয়া নতজানু হইয়া বসিয়া। ডাঃ সরকার স্তম্ভিত হইয়া এই অসম্ভব লীলা দেখিতেছেন।)

রাখাল—ওকি হচ্ছে ?

ঠাকুর—চুপ কর শালা। দেখ এই এক বাটী শেষ কোরেছি।

ডাঃ সরকার—(নতজানু হইয়া) সত্যই তুমি লীলাময়। আমায় জ্ঞান দাও, চৈতন্য দাও, উদ্ধার কবো।

(কালীপ্রসাদ চন্দ্রর প্রবেশ)

কালী—(ত্রস্তে ঘবে ঢুকিয়া) সর্ব্বনাশ হয়েছে, সর্ব্বনাশ হয়েছে, নরেন পাগল হয়ে গিয়েছে।

রাখাল—সে কি ! কি হয়েছে ?

কালী—নরেন আর গোপালদা একটা ঘরে ধ্যানে বসেছিলেন। হঠাৎ নবেন চেঁচিয়ে ওঠে, "গোপালদা গোপালদা আমাব শরীর কোথায় ?" গোপালদা তাব গায়ে মাথায় চাপড়িয়ে যতই বলছেন "কেন নরেন এই যে, এই যে তোমার শরীর," ততই নবেন বিড় বিড় কোরছে আর খালি কাঁদছে। গুরুভাইরা অনেকে গেছেন, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না—নবেন কাঁদছে আর মাঝে মাঝে বলছে "আমি কই, আমাব শরীর কৈ ?"—কি হবে ?

(ঠাকুরের মুখের দিকে উত্তরের জন্য তাকাইল। ঠাকুর নির্বিকাবভাবে পায়স খাইতেছেন আব মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।)

ঠাকুর—বেশ হয়েছে! থাক খানিকক্ষণ অমনি হয়ে। ওরই জন্যে যে আমায় জ্বালাতন করে তুলেছিল। আবার বাবুর রাগ হোত, অভিমান হোত। সেদিন নিজেকে ফকির কোরে আমার সব শক্তি ওকে দিলুম, তবু হোল না—নির্বিকল্প সমাধি চাই। এবার বুঝুক ঠেলাটা।

(কালী নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। যেন ইহা মনঃপূত হইল না।)

কি তোরও রাগ হোলো? আচ্ছা যা, ওকে এখানে নিয়ে আয়।

(কালীর প্রস্থান)

গিরিশ—ওর শুকনো জ্ঞানটাকে রসিয়ে ভক্তি করে দাওনা ঠাকুর।

ঠাকুর—ওরে ওর শরীরের লক্ষণ দেখিস নি? ও একজন পরম ভক্ত। জ্ঞান আর ভক্তি দুটো তলোয়ার নিয়ে ও খেলবে। একঘেয়ে হবে কেন? মাছের ঝোল, ঝাল অম্বল সব খাবে—শুধু এক রকম কেন?

(নরেন্দ্র ভাবাচ্ছন্ন ভাবে কালীর সঙ্গে প্রবেশ করিল।)

মা, আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলেন। আর এ নিয়ে চেঁচাবি না। চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল।

(নরেন্দ্র প্রণাম করিল)

নরেন্দ্র—কেন আমার সে অবস্থা ফিরিয়ে নিলেন? আমি ত বেশ শান্তিতে ছিলাম।

ঠাকুর—ছিঃ, এখনও তুই নিজের জন্যে ব্যস্ত! বার বার এ কথা বলতে তোর লজ্জা করে না? কোথায় তুই বিরাট বটগাছের মত শত শত শ্রান্ত লোককে শান্তি ছায়া দিবি, তা না নিজের মুক্তির জন্যে অস্থির! ছিঃ। এখন তোকে কাজ কর্তে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে তখন আবার চাবি খুলবো।

নরেন্দ্র—আবার কাজ? কি কাজ?

ঠাকুর—"যত মত তত পথ" এই সত্য আর "জীবকে শিব জ্ঞানে সেবা" এই আদর্শ প্রচার করবি। আয় বোস।

(নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছে খাটে বসিল, ঠাকুর সস্নেহে নরেন্দ্রকে দেখিতে দেখিতে)

খুব!

নরেন্দ্র—(সহাস্যে) খুব কি?

ঠাকুর—(সাদরে গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে) খুব ত্যাগ হয়ে আসছে। সময়ে স্নান নাই, খাওয়া নাই; চেহারাটা কি হোয়েছে দেখেছিস? শরীরের যত্ন করবি। খোলটা ঠিক না রাখলে কাজ করবি কি দিয়ে? একটা গান হোক—কি দেখলি এদের একটু বল।

নরেন্দ্র—

—গান—

সুর : বাগেশ্রী, আড়া।

নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥
অস্ফুট মন আকাশে, জগৎ সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
রহে মাত্র 'আমি' 'আমি এই ধারা অনুক্ষণ॥
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
অবাঙমনসোগোচরম, বোঝে—প্রাণ বোঝে যার॥

(গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধি মগ্ন)

রাখাল—ডাক্তার বাবু দেখুন ত, এ সমাধি না অন্য কিছু ?

ডাঃ সরকার—আমার বিদ্যা বুদ্ধি ওঁর কাছে কিছুই খাটে না।

(ঠাকুর ক্রমে জ্ঞানে আসিয়া যন্ত্রণায় খুব ছটফট করিতে লাগিলেন)

ঠাকুর—(যন্ত্রণাব মধ্যে) দেহের অসুখ! তা হবে। পঞ্চভূতের দেহ। দেহ ধারণ করলেই কষ্ট আছে। মা শরীরটা রাখবে না। সরল মূর্খ-পাছে সব দিয়ে ফেলে, একে কলিতে ধ্যান জপ নাই।

বাখাল—আপনি মাকে বলুন যাতে আপনার দেহ থাকে।

এই গানটী স্বামীজীর স্বরচিত।

ঠাকুর—(একটু চুপ করিয়া) আর বল্লে কই হয় ? এখন দেখছি এক হয়ে গেছে। (যন্ত্রণায় ছটফট কবিতে লাগিলেন) তোমরা আপনার জন। একটা গুহ্য কথা বলি, শোন। সেদিন দেখলাম আমার ভেতর থেকে সচ্চিদানন্দ বাইরে এসে রূপ ধারণ কোরে বল্লে "আমিই যুগে যুগে অবতার।" দেখলাম পূর্ণ আবির্ভাব, তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য্য। সেই সচ্চিদানন্দ বই আর কিছু নেই ; দেহটা খোল মাত্র।

নরেন্দ্র—(স্বগতঃ) অবতার! ভগবান! সত্যই কি ভগবান! এই রক্ত মাংসের শরীর, জরা ব্যাধি মৃত্যুর অধীন। রোগ যন্ত্রণায় এত কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু কি অসীম সাধনার শক্তি! মহাপুরুষ, অতি-মানব কিংবা দেব-মানবও বলতে পারি। কিন্তু স্বয়ং ভগবান কি করে বলি ?

(ঠাকুর খুব ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন)

রাখাল—আমার কেমন ভাল লাগছে না। আমি যাই সকলকে ডেকে আনি।

(প্রস্থান)

নরেন্দ্র—(স্বগতঃ) গিরিশ বলে ইনি অবতার, ঈশ্বর ; উনিও তাই বলেন। এই যন্ত্রণার মধ্যেও যদি ঐ কথা বলতে পারেন তবে স্বীকার কোরব উনি অবতার, উনি ঈশ্বর।

ঠাকুর—(ঈষৎ হাসিয়া যন্ত্রণা কাতর কণ্ঠে) ওরে এখনও সন্দেহ! এখনও

অবিশ্বাস ? যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই এই রামকৃষ্ণ। তবে তোর বেদান্তর দিক দিয়ে নয়।

নরেন্দ্র—(চমকিত হইয়া) ঠাকুব ঠাকুর—আর অবিশ্বাস নাই। সমস্ত সন্দেহ আমার কেটে গেল। আজ আমিও স্বীকার কোরছি "যে রাম, যে কৃষ্ণ, তিনিই এই রামকৃষ্ণ"। ধর্ম্মের গ্লানি দূর কবাব জন্যে, সাধুদের পবিত্রাণের জন্যে দুষ্কৃত দমনের জন্যে, যুগে যুগে তুমি দেহ ধারণ কবেছো। তোমার এই লীলাও সেই অনন্ত লীলারই একটি রূপ। হে লীলাময় হে অবতার, হে ঈশ্বর, আমাদের জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক বৈরাগ্য দাও, চৈতন্য দাও, আমাদের সর্ব সত্ত্বা তুমি গ্রহণ করো!

(করজোড়ে)

স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে
অবতারবরিষ্ঠায় বামকৃষ্ণায় তে নমঃ।

(সকলেব প্রণাম)

(রাখালের সঙ্গে অন্যান্য ভক্তবৃন্দের প্রবেশ। নবেন্দ্র, গিবিশ, ডাঃ সরকাবকে নতজানু ও কৃতাঞ্জলি দেখিয়া তাঁহারা সকলেই ঐ ভাবে বসিলেন। স্তবশেষে সকলেই প্রণাম কবিলেন। ঠাকুর বরাভয় মুদ্রা ধবিয়া খাটে বসিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ কবিলেন ও ধীবে ধীবে তিনবার "কালী" নাম উচ্চারণ করিয়া "ওঁ" বলিয়া মহাসমাধিতে মগ্ন হইলেন। ভক্তেবা প্রায় একসঙ্গে কাঁদিয়া উঠিল "ঠাকুর ঠাকুব"।)

যবনিকা পড়িল।

যবনিকার অন্তরালে স্তব চলিতে লাগিল।

—স্তব—

খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নবরূপধর, নির্গুণ গুণময়॥
মোচন-অঘদূষণ (১) জগভূষণ, চিদঘনকায়।
জ্ঞানাঞ্জন-বিমল-নয়ন বীক্ষণে মোহ যায়॥

---

(১) মোচন-অঘদূষণ—যিনি দূষণ অর্থাৎ মানুষকে দূষিত করে এমন সে অঘ অর্থাৎ পাপ তাহাকে মোচন করেন।

অভিনেতাদের প্রতি

এই নাটক যাঁহারা অভিনয় করিবেন, তাঁহাদের সুবিধার জন্য কয়েকটী কথা বলা দরকার মনে করি।

নাটকটীর অভিনয় আরম্ভের পূর্ব্বে মঞ্চে একটী উচ্চাসনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি বড় প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করিয়া রাখিবেন। পাশে ধূপ দীপ থাকিবে, কেহ বা ব্যাজন করিবেন। যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে একদল সন্ন্যাসী খোল করতালসহ স্বামী বিবেকানন্দ রচিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই স্তোত্র গাহিয়া যাইবেন।

সুর—মিশ্র চৌতাল।

খণ্ডন-ভব-বন্ধন জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নবরূপধর, নির্গুণ গুণময়॥
মোচন-অঘদূষণ জগভূষণ চিদঘনকায়।
জ্ঞানাঞ্জন-বিমল-নয়ন বীক্ষণে মোহ যায়॥

স্তোত্র শেষে যবনিকা পড়িলে, ঠাকুরের প্রতিকৃতি সরাইয়া, সেখানে ছবির উপবিষ্ট ভঙ্গীতে অভিনেতা ঠাকুর বসিবেন ও অন্যান্য অভিনেতাগণ নিজেদের আসন গ্রহণ করিবেন। ইহাতে অভিনয়ের গাম্ভীর্য্য বাড়িবে ও শ্রদ্ধাশীল আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে মনে হয়।

ঠাকুর সাধারণতঃ লালপেড়ে আট হাতি কাপড় পড়িতেন ও গা খোলা রাখিতেন। বাহিরে গেলে জিনের কোট পরিতেন, হাতে শুপুরীর বটুয়া ও পায়ে সে আমলের বানিশ করা চটী জুতা থাকিত। শীতকালে গায়ে সাধারণ র‍্যাপার দিতেন। একটু তোতলা ছিলেন। অভিনয়ের সময় অভিনেতার এ সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিলে ভাল হয়।

নাটকের ঘটনা ৬৫।৭০ বৎসর পূর্ব্বের; কাজেই সে সময়ের উপযোগী প্রবীণ ও নবীনদের পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হওয়া প্রয়োজন। রূপসজ্জার সুবিধার জন্য ঠাকুরের এবং নরেন্দ্রনাথ, ডাঃ মহেন্দ্র সরকার, গিরিশ ঘোষ ও মহেন্দ্র মাষ্টারের (পরিণত বয়সের) ফটো নাটকে সংযোজিত হইল।

গ্রন্থকার

লেখকের অন্যান্য বই

ভ্রমণকাহিনী

পশ্চিম প্রবাসী (সচিত্র)	...	...	...	৭॥০
রাশিয়া ভ্রমণ (সচিত্র)	...	...	...	১।০
তুষারতীর্থ অমরনাথ (সচিত্র)		...	...	১॥০
Russia To-day (Second Edition)		...	...	৩৲
Himalayas, In & Across (সচিত্র Second Edition)				২৲

গল্প

অগ্রগতি	...	...	..	১।০
মাটীর পুতুল	...	...	...	১৲
কাঁটা	...	...	...	১॥০

নাটক

ভূল (তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ নাটক)	...	...	১৲
দৈবাৎ (এক দৃশ্যের কৌতুক নাটিকা)	...	...	।০
রক্ততিলক (তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ নাটক)	...	...	২৲
ছন্দ-পতন (যন্ত্রস্থ)			

বিবিধ

চিত্রে রুশ বিদ্রোহের ইতিহাস		...	...	৸০
দুধের ব্যবসা	...	...	...	১॥০
Banker's Guide (2nd. Ed.)		...	...	৮৲
Modern Agriculture		...	...	৸০